স্বস্তিকা

দাম : ষোলো টাকা

শীতে ত্বকের সমস্যা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে প্রচুর জল ও মরসুমি ফল খান — পৃঃ ২৫

পশ্চিমবঙ্গে নারীনিগ্রহ মহামারীর আকার ধারণ করেছে — পৃঃ ১১

৭৭ বর্ষ, ১২ সংখ্যা।। ২৫ নভেম্বর, ২০২৪।। ৯ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

শীতে কীভাবে সুস্থ থাকবেন

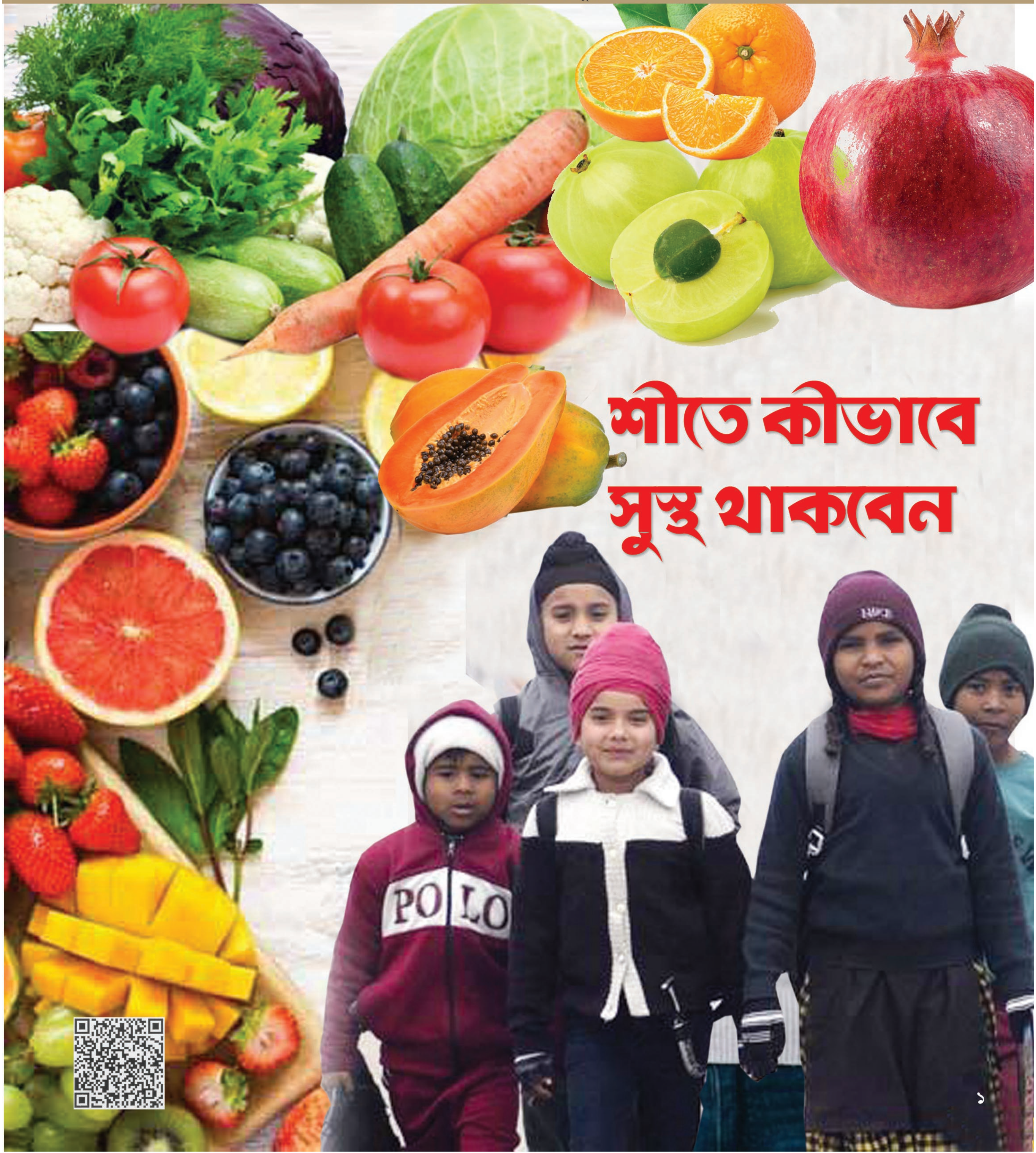

CENTURYPLY®

CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ১২ সংখ্যা, ৯ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

২৫ নভেম্বর - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

মমতার পা লেগে এ রাজ্যের ধুলোও এখন কলঙ্কিত কলঙ্কিত কেলেঙ্কারি ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

আমরা সবাই চোর, দিদিমণির... ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

আবুজা থেকেই হোক আফ্রিকান সাফারি শুরু ◻ রাজীব ভাটিয়া ◻ ৮

কলকাতায় হচ্ছে না বাংলাদেশ বইমেলা, কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায়ও ব্রাত্য বাংলাদেশ ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

পশ্চিমবঙ্গে বলাৎকার মহামারীর আকার ধারণ করেছে ◻ সাধন কুমার পাল ◻ ১১

বাঙ্গালি বিপ্লবীদের দৃষ্টিতে বিনায়ক দামোদর সাভারকর ◻ বিনয়ভূষণ দাশ ◻ ১৩

চট্টগ্রাম ভারতের—আজকে এই দাবি যুক্তিসঙ্গত ◻ সেন্টু রঞ্জন সরকার ◻ ১৭

পশ্চিমবঙ্গের বয়স্ক মানুষদের শীতকালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ◻ ডাঃ সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ◻ ২৩

শীতে স্বাস্থ্য সচেতনতা ◻ ডাঃ সন্দীপন নন্দন ঘোষ ◻ ২৪

শীতে ত্বকের সমস্যা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে প্রচুর জল ও মরসুমি শাকসবজি খান ◻ ডাঃ ইমরান ওয়ালি ◻ ২৫

শীতে পরিযায়ী পাখির ইচ্ছে-ডানা ◻ তাপস অধিকারী ◻ ২৬

খেজুরে হাঁড়ি বসেছে গ্রামবাঙ্গলার দিকে দিকে ◻ কল্যাণ গৌতম ◻ ২৯

প্রাক্-শীত ও শীতকালীন পূজা-পালাপার্বণ ◻ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ◻ ৩১

স্বাধীনতার এক বহ্নিশিখা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ◻ সৌমিত্র সেন ◻ ৩৪

শীতের বনভোজন ব্যক্তি ও সমাজের বন্ধুকে দৃঢ় করে ◻ পিন্টু সান্যাল ◻ ৩৫

শীতকালে চোখকে সুস্থ রাখার একমাত্র উপায় দিনে তিনবার পরিষ্কার জল দিয়ে চোখ ধোয়া ◻ ডাঃ জ্যোতির্ময় দত্ত ◻ ৩৭

শীতকালীন অর্থকরী ফুল ◻ মিলন খামারিয়া ◻ ৩৮

প্রচণ্ড শীতেও সীমান্ত রক্ষায় অতন্দ্রপ্রহরী ভারতীয় সেনা ◻ কর্নেল কুণাল ভট্টাচার্য (অবসরপ্রাপ্ত) ◻ ৪৩

সারস্বত সাধক দীননাথ বত্রা : এক পরিচয় ◻ দেবাংশু পতি ◻ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ :

◻ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ◻ **অঙ্গনা : ২১** ◻ **সুস্বাস্থ্য : ২২** ◻ **সমাবেশ সমাচার : ৩০** ◻ **খেলা : ৩৯** ◻ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ◻ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৫০**

প্রকাশিত হবে ২ ডিসেম্বর, ২০২৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২ ডিসেম্বর, ২০২৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বিপ্লবীদের স্মরণ

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ইংরেজি ডিসেম্বর মাসের গুরুত্ব কম নয়। এই মাসেই ভারতমাতার দামালপুত্র-ত্রয় বিনয়-বাদল-দীনেশ রাইটার্সের অলিন্দযুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। এছাড়া আরও কয়েকজন বিপ্লবীর এই মাসেই আবির্ভাব ও তিরোধান।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিপ্লবীদের স্মৃতিচারণ করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693

IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বাঙ্গালির শীত

ষড়ঋতুর দেশে বঙ্গজীবনে শীতঋতুর প্রভাব একটু বেশিমাত্রায় অনুভূত হইয়া থাকে। ইদানীং বিশ্বউষ্ণায়নের কারণে বাঙ্গালি যেন শীতকে আরও বেশি আপনার করিয়া লইয়াছে। প্রকৃতি দেবীও দুইহাত ভরিয়া প্রাচুর্যের সম্ভার লইয়া উপস্থিত হন। বাঙ্গালি মন প্রাণ ভরিয়া তাহা উপভোগ করিয়া থাকে। প্রকৃতিজাত নানান খাদ্য সম্ভারের সহিত শীতের উৎসবেও বাঙ্গালি মাতিয়া ওঠে। শীতের শুরুতে নবান্ন উৎসব দিয়া তাহার সূচনা। নূতন ধান্য উঠিবার কারণে গ্রামীণ বাঙ্গালি সুখের আস্বাদ অনুভব করিয়া থাকে। আর পৌষের শেষে পৌষপার্বণ বঙ্গ জীবনে আনন্দের হিল্লোল বহিয়া আনে। কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহার পৌষপার্বণ কবিতায় হাস্যরসের সহিত সেই আনন্দের বর্ণনা করিয়াছেন। কবি সুনির্মল বসুও তাঁহার পৌষপার্বণ কবিতায় আনন্দরসের বর্ণনা দিয়াছেন। এমন করিয়াই শীতঋতু প্রবেশ করিয়াছে বাংলা সাহিত্যে। জীবনানন্দ দাশ তাঁহার বেশ কয়েকটি কবিতায় তিনি নিজেই শীতের সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছেন। কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহার 'মালিনী নায়িকার মানভঙ্গ' কবিতায় কৌতুক ও হাস্যরসের সহিত শীতের বর্ণনা করিয়াছেন। সুখ ও আনন্দে ভরপুর হইলেও শীতঋতু যে কঠোর ও রুক্ষ তাহারও বর্ণনা রহিয়াছে বাংলা সাহিত্যে। মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ফুল্লরার বারোমাস্যায় ধরা পড়িয়াছে শীতের কঠোর রূপের বর্ণনা। এই বর্ণনা দরিদ্র পল্লীজীবনের বাস্তব চিত্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিভিন্ন ঋতু লইয়া বহু কবিতা ও গান রচনা করিলেও শীত লইয়া মাত্র কয়েকটি কবিতা রচনা করিয়াছেন। তিনি শীতকে বসন্তের অগ্রদূত বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন— এসেছে শীত গাহিতে গীত বসন্তের জয়। আবার, তিনি শীতকে নির্মম এবং সমস্ত কিছুকে হারিয়ে ফেলিবার ঋতু হিসাবেও উল্লেখ করিয়াছেন। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত শীতকে কখনো সর্বনাশী, কখনো রুদ্র সন্ন্যাসী, কখনো ভয়ংকর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও আপামর বাঙ্গালি পরিপূর্ণভাবে শীতকে উপভোগ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে।

শীতকে উপভোগ করিবার আনন্দ ও হুল্লোড়ের মধ্যেও বাঙ্গালিকে শীতের দংশনের কথা মনে রাখিয়া সাবধান থাকিতে হয়। শীতের দংশন শুধু তাহার হিমেল হাওয়াই নহে, শীত যে তাহার সহিত বিভিন্ন প্রকারের অসুখবিসুখ আনিয়া থাকে তাহা মনে রাখিতে হয় বই কী! শীতকালে বাতাস ঠাণ্ডা হইয়া ঘন হইয়া পড়ে, তাহার ফলে বায়ুদূষক পদার্থগুলি নীচে নামিয়া আসে এবং ফুসফুসে প্রবেশ করিয়া নানাজাতীয় রোগব্যাধির সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই সময় সর্দিজ্বর, কাশি, নিউমোনিয়া, হাঁপানি, চোখওঠা, বদহজম, খুসকি, চর্মরোগ মানুষকে কাবু করিয়া ফেলে। অসাবধান হইলেই প্রাণসংশয় ঘটিতে পারে। শীতকালে বড়ো বড়ো শহরগুলিতে ধোঁয়াশা খুব উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। এই ধোঁয়াশা মানবস্বাস্থ্যের পক্ষে সংকটস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাবধান না হইলে ফুসফুসের ক্যানসার নাকি অনিবার্য। চিকিৎসকদের মতে করোনার মতো মারণ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব না হইলেও শীতকালে মুখাবরণী ব্যবহার আবশ্যিক। শীতকে পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে চাইলে চিকিৎসকের পরামর্শ মানিয়া চলিতেই হইবে।

শীতকে যথার্থভাবে উপভোগ করিবার পাশাপাশি এই কথা ভুলিলে চলিবে না যে এক বিশাল সংখ্যক দরিদ্র মানুষের নিকট শীত শুধুই বিড়ম্বনা ব্যতীত কিছুই নহে। আমাদের দেশের হিমালয় সন্নিহিত পার্বত্য এলাকায় শীতকালে জনজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। এই সময় পল্লীগ্রামের দরিদ্র মানুষ অতি কষ্টে দিন অতিবাহিত করিয়া থাকেন। শীতকালে তাহাদের জীবন কালকেতু-ফুল্লরার জীবনের প্রতিচ্ছবি হইয়া ওঠে। তাঁহারা তীব্র শীতের অবসান কামনা করিয়া থাকেন। তাহাদের জন্য রবীন্দ্রনাথের সহিত ইংরাজ কবি শেলী শুনাইয়াছেন অভয়বার্তা — শীত আসিলে কি বসন্ত দূরে থাকিতে পারে?।

সুভাষিতম্

একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
বাসিতং তদ্বনং সর্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা।।

একটি মাত্র উত্তম বৃক্ষ যেমন তার পুষ্পগন্ধের দ্বারা সমগ্র বনকে আমোদিত করে, তেমনই একটি সুপুত্র সমগ্র বংশের মুখ উজ্জ্বল করে।

মমতার পা লেগে এ রাজ্যের ধুলোও এখন কলঙ্কিত

কলঙ্কিত কেলেঙ্কারি

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গকে বদনাম করা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। বদনামের সঙ্গে নাম কথাটা যুক্ত থাকলেও তেরো বছর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনে তা ক্ষয়ে গিয়েছে। তবে ভোটের ফল তা বলে না। তাই বদনামের 'বদ'টা থেকেও নেই। কিছু স্তাবক আর শাবক 'ইন্দিরা ইজ ইন্ডিয়া'র মতো 'মমতা ইজ বেঙ্গল' বলছে। গোরু, কয়লা, বালি, চাল, চাকরি চুরির পর এখন ট্যাব কেলেঙ্কারি। অনেকের মত, কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী সিনেমার বাস্তবায়ন হচ্ছে কলঙ্কিনী মমতাবতী। মাছরাঙার কলঙ্কিনী হওয়ার প্রবাদ এ রাজ্যে খাটবে না। পশ্চিমবঙ্গের 'মালটিকালচারাল' সংস্কৃতি এখন 'মালটিকেলেঙ্কারি' বা বহুমুখী দুর্নীতিতে ডুবেছে। তা কেবল আর্থিক নয়। বাংলাদেশে লজ্জাকর হিন্দুনিধন যজ্ঞের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

মমতা দাবি করেন তিনি ধর্মনিরপেক্ষ। তবে খোলা চোখে দেখলে দাবিটি অবশ্যই স্বতন্ত্র আর সুবিধাবাদ পুষ্ট। লজ্জারও বটে। ভোট আর ক্ষমতার স্বার্থে তা নড়বড়ে আর সন্দেহ জাগায়। তাই কোনোভাবেই ধর্মনিরপেক্ষ বলা যাবে না। সেখানে নিরপেক্ষতার মোড়কে ইসলামীকরণ ঢাকা যায় না। অনেকের মত, মমতা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করেন। সেটাই তাঁর দুর্নীতির বর্ম। মমতা আর তার দলবলের জন্য রাজ্যের ধুলো এখন কলঙ্কিত। কেলেঙ্কারির কাদা মেখেই মমতা নিজেকে জিইয়ে রেখেছেন। মানতেই হবে সে কাদা সরাতে বিরোধীরা এখন অপারগ। দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই বোধহয় একমাত্র রাজ্য যেখানে কেলেঙ্কারির বাড়বাড়ন্তের মধ্য দিয়ে সরকার আর প্রশাসন চলতে থাকে। অত্যাচার-অবিচার নিয়ে অনেক রাজ্যের ঘটনা লেখা হলেও পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে কেন্দ্র বা অন্য রাজ্য স্তরে কোনো হেলদোল নেই। মনে হয় সকলেই এই রাজ্যটিকে ভবিষ্যৎ খরচের খাতায় তুলে দিয়েছে।

আরজি কর হাসপাতালে নৃশংস অভয়া হত্যা ঘিরে যে ধরনের আন্দোলন আর বিতর্কের ঝড় উঠেছিল সময়ের সঙ্গেই তা স্তিমিত হয়ে যায়। অন্য সব অন্যায়ের মতো এই অন্যায়টিও কোনো অন্যরকম সমঝোতায় ঢাকা পড়ল কিনা তা নিয়ে মানুষ দিশেহারা। এটা বোঝা গেল না কেনই-বা সুপ্রিম আদালতের প্রধান বিচারপতি স্বেচ্ছায় মামলাটি দু'মাসের জন্য নিজের এজলাসে টেনে নিয়ে প্রায় কিছু না করেই বিদায় নিলেন। দু'মাসের নিষ্ফলা আদালত তরঙ্গের সঙ্গে তৃণমূল সুপ্রিমোর চতুর রাজনীতি আর রাজ্য প্রশাসনের তরল মিশে আরজি করের আন্দোলনকে ভোঁতা করে দিল। হাথরাস, কাঠুয়া আর উন্নাওয়ের ঘটনা নিয়ে যারা দেশজুড়ে আওয়াজ তোলে সেই কংগ্রেস আর বামপন্থীরা এখানে শাসক তৃণমূলের লেজুড় হয়ে কাজ করে। সবাই মিলে কেলেঙ্কারি-সর্বস্ব রাজ্যকে আরও বেশি করে কলঙ্কিত করে তোলে। কার স্বার্থে? কেবলমাত্র বিজেপিকে আটকাতে। শাসকের দুষ্কৃতী পালনের রাজনীতি এবং নাগরিক সুরক্ষার অভাব এ রাজ্যে হাতে হাত ধরে চলে। শাসক দলের কাউন্সিলরকে 'দুষ্কৃতী বা গুন্ডা' চিহ্নিত করে তাকে হত্যার বরাত দেয় একজন সাধারণ নাগরিক।

> **২০২৬-এর ভোট মমতার কাছে যত না বড়ো চ্যালেঞ্জ তার চতুর্গুণ বিজেপির। যে রাজ্যে কেলেঙ্কারিও কলঙ্কিত হয়ে গিয়েছে সেখানে লড়াইটা যে খুব সোজা হবে সেটা মনে করা বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।**

সেই নাগরিকের দাবি, প্রতিশোধস্পৃহা থেকেই সে ওই বরাত দিয়েছিল। কারণ তৃণমূলের গুন্ডা কাউন্সিলর জোর করে তার জমি কেড়ে নিয়েছে। এটা মানতে কোনো অসুবিধা নেই যে মমতার প্রশাসনিক দুর্নীতির সঙ্গীদের এই বাড়বাড়ন্ত খানিকটা হলেও রুখে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি।

তৃণমূলের একটাই সুবিধা। খুব ছোটো দল হওয়ার ফলে তার কেলেঙ্কারির বহর আর কলঙ্কের সীমা কেবল এই রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ফলে ১৮টি রাজ্য শাসন করা বিজেপিকে পালটা আক্রমণ করা তার পক্ষে অনেকটা সোজা। ছোটো মাছ বড়ো জলে খেলতে পারে। বড়ো মাছের পক্ষে ছোটো পরিসরে খেলতে যে সময় লাগবে সেটা নিশ্চিত। রাজ্য বিজেপি হয়তো সে সময়টাই নিচ্ছে। আর তা যতক্ষণ না হয়ে উঠছে সব কেলেঙ্কারির দৌলতে রাজ্য কলঙ্কিত হতে থাকবে। রাজ্যে যত কেলেঙ্কারি হয়েছে তার মাথা হিসেবে মমতাকেই চিহ্নিত করা হয়। সিংহের সামনে ছাগলকে ভালো খাবার দিলেও তার ওজন কমে। অভয়া কাণ্ডের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সে দশা যদি হয়ে থাকে তাহলে সিংহ হিসেবে তা জিইয়ে রাখার দায়িত্ব অবশ্যই বিজেপির। তাই ২০২৬-এর ভোট মমতার কাছে যত না বড়ো চ্যালেঞ্জ তার চতুর্গুণ বিজেপির। যে রাজ্যে কেলেঙ্কারিও কলঙ্কিত হয়ে গিয়েছে সেখানে লড়াইটাই যে খুব সোজা হবে সেটা মনে করা বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তা সে চূড়ান্ত কলঙ্কিত হোক না কেন। □

আমরা সবাই চোর, দিদিমণির...

দুর্নীতিমদতেষু দিদি,

পঞ্চায়েত থেকে নবান্ন সর্বত্র নাকি খোঁজ করলেই দুর্নীতির খবর পাওয়া যায়। আমি বলছি না দিদি। এসব খবরের কাগজেই দেখি। জানি, আপনি এ সবকে মদত দেন না তবে লোকে এটাকে 'চোরের রাজত্ব' বলছে। আমি বলিনি কিন্তু দিদি। দেখুন চিঠির শিরোনামে সে সব কিছুই লেখা নেই। ওই জায়গাটা আমি ফাঁকা রেখেছি।

তবে দিদি, সরকারি নথিও বলছে সেই সব কথা। আমি কিন্তু মোটেও বলিনি। দিদি, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স ন' বছর। আপনি ক্ষমতায় এসেই সেই বড়ো কাজটা করেছিলেন। কিন্তু দিদি, কীভাবে চলছে সেই বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চয়ই জানেন। এই ন' বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক আর্থিক বেনিয়ম হয়েছে বলে দাবি করেছে কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (ক্যাগ)। রাজ্যের প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের পক্ষে চিঠিও পাঠানো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়কে। গত ৯ সেপ্টেম্বর পাঠানো সেই চিঠিতে যে যে অনিয়ম ও অস্বচ্ছতার অভিযোগ মিলেছে তার জবাব চাওয়া হয়েছে। চার সপ্তাহের মধ্যে জবাব চাওয়া হলেও বিশ্ববিদ্যালয় এখনও তা দেয়নি।

২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়। সেই সময় থেকে অর্থাৎ ২০১৫-১৬ আর্থিক বছর থেকে ২০২২-২৩ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচের অডিট করে ক্যাগ। সেই রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের হিসেবে অস্বচ্ছতার অভিযোগ যেমন রয়েছে, তেমনই অনেক ক্ষেত্রে নিয়ম ভেঙে বিভিন্ন সংস্থাকে কাজের বরাত দেওয়া হয়েছে বলেও দাবি ক্যাগের। ১২ জন অধ্যাপকের পদোন্নতির ক্ষেত্রে নিয়ম মানা হয়নি বলেও রিপোর্ট উল্লেখ করেছে ক্যাগ।

ক্যাগের রিপোর্টের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে উপাচার্যের বাংলো এবং কর্মীদের আবাসন বানানোর ক্ষেত্রে নির্মাণকারী সংস্থাকে অতিরিক্ত ২৫.৮১ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা। নিয়ম ভেঙে ৫৫ লক্ষ টাকা অগ্রিম দেওয়া নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে ক্যাগ। ওই কাজের বরাত প্রথমে রাজ্য সরকার অনুমোদিত সংস্থাকে দেওয়া হলেও পরে তা নিয়ম ভেঙে অন্য এক সংস্থাকে দেওয়া হয় বলেও দাবি ক্যাগের। সেই সঙ্গে বলা হয়েছে, ওই সংস্থাকে কোনো আইনি ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়নি, বিশ্ববিদ্যালয় কোনো চুক্তিও করেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণের প্রজেক্ট রিপোর্ট বানাতেই ৩৭.৬৮ লক্ষ টাকা খরচ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে ক্যাগ। এছাড়াও রাজ্য সরকারের টেন্ডার নীতি অমান্য করে কয়েকটি সংস্থাকে বারবার বিভিন্ন কাজের বরাত দেওয়া হয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে কোনো দরপত্রের বিজ্ঞপ্তিই জারি করা হয়নি। ভাবতে পারেন দিদি! এত দুর্নীতির কথা আমি কিন্তু বলছি না। বলছে সরকারি ক্যাগ রিপোর্ট।

ন' বছরে বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের জন্য তিনটি মোটর গাড়ি কেনা হয়েছে। ৪৩.২৯ লক্ষ টাকার গাড়ি কেনার ক্ষেত্রে কোনো টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়নি। যদিও আপনার সরকারের নিয়ম অনুযায়ী একটি বিলে পাঁচ লক্ষ টাকার বেশি খরচ করতে হলে ই-টেন্ডার বাধ্যতামূলক। এছাড়াও দুটি দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি দিতে হয়। গাড়ির ক্ষেত্রে রাজ্যের নিয়ম জিইএম (গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস) থেকেই কিনতে হবে। কিন্তু রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় কোনো নিয়মই মানেনি বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা রয়েছে। এর মধ্যে একটি গাড়ি কেনার অগ্রিম দিয়ে দেওয়া হয় উপাচার্যের অনুমোদনের আগেই। শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয় এক কোটি টাকার বেশি তথ্য-প্রযুক্তি সংক্রান্ত সরঞ্জাম কেনার ক্ষেত্রেও কোনো টেন্ডার প্রকাশ করেনি।

দরপত্র না ডেকে বিভিন্ন সংস্থাকে সরাসরি আড়াই কোটি টাকার কাজের বরাত দেওয়ায় কর বাবদ আপনার সরকারেরই ক্ষতি হয়েছে সাত লক্ষের বেশি টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিন বনানোর ক্ষেত্রেও ২২ লক্ষ টাকার খরচকে 'সন্দেহজনক' বলেছে ক্যাগ। সিসিটিভি ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার, স্মার্ট ক্লাসরুম বানানো কিংবা কলকাতার সল্টলেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ভাড়া নেওয়া তিন কামরার ফ্ল্যাট-সহ অনেক কিছু নিয়েই অস্বচ্ছতার অভিযোগ রয়েছে ক্যাগের রিপোর্টে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতি-নিয়মের তোয়াক্কা করা হয়নি বলে দাবি। এমন নানা তথ্য দেওয়ার পাশাপাশি ক্যাগের দাবি, ২০১৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ৯৭ লক্ষ টাকার চেয়ার টেবিল কেনে। যা দোকান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আনতে খরচ হয়েছে ৫.৪৮ লক্ষ টাকা। এছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের এমন বহু লক্ষ টাকার খরচ দেখানো হয়েছে যার যথাযথ রসিদ নেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে।

আপনিই বলুন দিদি, এত অভিযোগ মেনে নেওয়া যায়! আপনার 'স্বচ্ছ ভাবমূর্তি' নষ্ট করতে বসে আছে এক দল লোক। বড়ো কাজ করতে গেলে দুর্নীতি তো হবেই। এত বছর হয়ে গেলেও এটা কেউ মেনে নিতে পারছে না। সত্যিই রাগ হয় দিদি। আবার সবাই নাকি কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারের সঙ্গে তুলনা করছে। আরে কেন্দ্রে চুরি হয় না বলে কি রাজ্যও করতে পারবে না? □

আপনার 'স্বচ্ছ ভাবমূর্তি' নষ্ট করতে বসে আছে এক দল লোক। বড়ো কাজ করতে গেলে দুর্নীতি তো হবেই। এত বছর হয়ে গেলেও এটা কেউ মেনে নিতে পারছে না। সত্যিই রাগ হয় দিদি।

অতিথি কলম

রাজীব ভাটিয়া

আবুজা থেকেই হোক আফ্রিকান সাফারি শুরু

ভারত-নাইজেরিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য, এই বিষয়ক পড়াশোনা বা গবেষণার প্রসারের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা কেন্দ্রগুলিকে আর্থিক সহায়তাদান প্রয়োজন। দুই দেশের নাগরিক পর্যায়ে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি, দুই দেশের সাধারণ মানুষের বৃহত্তর মেলবন্ধন দীর্ঘমেয়াদে উপযুক্ত ফলদায়ী হবে ।

দু'দিনের সফরে নাইজেরিয়া গেলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত ১৬ নভেম্বর নাইজেরিয়ার রাজধানী আবুজায় পৌঁছেছিলেন মোদীজী। নাইজেরিয়া সফরের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর আন্তঃমহাদেশীয় সফরের প্রথম পর্যায়। এই সফরের সঙ্গে যুক্ত ছিল আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্মেলন কেন্দ্রিক কূটনীতি। সফর এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে ১৮-১৯ নভেম্বর ব্রাজিলে জি-২০ সম্মেলনেও যোগ দিয়েছিলেন তিনি। শিখর সম্মেলন শেষে তিনি গিয়েছিলেন গায়ানায়।

এই সফরে ভারতের সামনে আসতে চলেছে একটি সুবর্ণ সুযোগ। এই সফরের মাধ্যমে আফ্রিকা এবং 'গ্লোবাল সাউথ'-এর সঙ্গে ভারতের মেলবন্ধন হয়ে উঠবে সুদৃঢ়। কূটনৈতিক সমঝোতার পাশাপাশি ভারতের সঙ্গে দেশগুলির সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। দেশগুলির প্রতি ভারতের সহযোগিতার ধারাটি যদিও অনেক দিন ধরেই ক্রমবর্ধমান। বিষয়টিতে এই সফর নতুন গতিসঞ্চার করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আফ্রিকার তিনটি দেশে ভারতীয় রাষ্ট্রপতির সাম্প্রতিক সফরের পরেই শুরু হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর আফ্রিকা সফর।

আফ্রিকা সফরের ক্ষেত্রে নাইজেরিয়াকে গন্তব্যস্থল হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন বিশেষ তাৎপর্যবাহী। আফ্রিকার সর্বাপেক্ষা জনবহুল দেশ হলো নাইজেরিয়া। আফ্রিকার মধ্যে সর্বাধিক জনসংখ্যা সম্পন্ন হওয়ার পাশাপাশি নাইজেরিয়া হলো আফ্রিকা মহাদেশের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি। ভারতের সঙ্গে এই দেশটির রয়েছে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। মৈত্রীর সম্পর্ক ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে রয়েছে 'স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ' বা 'কৌশলগত অংশীদারিত্ব'। অন্তর্দেশীয় সম্পর্ক রক্ষা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে ধরে রাখা এবং আগামীদিনে সেই সম্পর্কের উন্নতি সাধনে ক্রিয়াশীল থাকার লক্ষ্যে ভারত নিরবচ্ছিন্নভাবে অসংখ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। প্রতিটি পদক্ষেপের পিছনে রাজনৈতিক স্তরে জোরদার প্রয়াসের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। নাইজেরিয়ার মতো একটি দেশের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রয়াস বিশেষভাবে প্রয়োজন। কারণ, আফ্রিকায় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নাইজেরিয়া যথাক্রমে একটি আঞ্চলিক ও মহাদেশীয় শক্তিকেন্দ্র।

প্রাচীন সভ্যতা, সমৃদ্ধ সংস্কৃতিগত পরম্পরা; জাতিগত, উপাসনা পদ্ধতিগত ও ভাষাগত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বিধানের দৃঢ় মানসিকতা এবং কমনওয়েলথ গোষ্ঠীভুক্ত দেশ হওয়ার সুবাদে ভারতের সঙ্গে নাইজেরিয়ার অনেকটাই সাদৃশ্য রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে চলা গৃহযুদ্ধ এবং একাধিকবার সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে অতীতে নাইজেরিয়া হয়েছে বিপর্যয়-বিধ্বস্ত। সেই কঠিন কালচক্রের সঙ্গে লড়াইয়ের অবসান হয় ১৯৯৯ সালে। কঠিন সময়পর্বকে অতিক্রম করে ওই বছর একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে নাইজেরিয়া।

উন্নয়নযজ্ঞে সব শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তি এবং সবাইকে শামিল করে সৃষ্ট ভারতের 'ডেমোক্রেসি উইথ ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট' বা জনকল্যাণমূলক গণতন্ত্রের আদর্শ অনেকাংশে নাইজেরিয়াকে ভারতের প্রতি আকর্ষণে সহায়ক হয়েছে। এই সম্পর্ক নির্মাণে প্রবাসী ভারতীয়দের অবদানও অনস্বীকার্য। এক্ষেত্রে ভারতীয় শিক্ষক ও ব্যবসায়ীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন আবশ্যক। তাদের অসাধারণ কাজের দরুন দু'টি দেশের মানুষ পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছে। দু'টি দেশের পারস্পরিক মেলবন্ধনের ক্ষেত্রে কৃতিত্ব রয়েছে বলিউডেরও। এইভাবে নানা প্রক্রিয়া দু'টি দেশকে কাছাকাছি নিয়ে এসেছে।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জওহরলাল নেহরু ১৯৬২ সালে নাইজেরিয়া সফর করেন। এরপর ২০০৩ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী, ২০০৭ সালে মনমোহন সিংহ নাইজেরিয়া সফর করেছিলেন। এই তিনজন প্রধানমন্ত্রীর পর নরেন্দ্র মোদী হলেন চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী যিনি নাইজেরিয়া সফর করলেন। মনমোহন সিংহের নাইজেরিয়া সফরের পর বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর এই সফরের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ১৭ বছর। যদিও ২০১৬ সালে তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি নাইজেরিয়া সফরে যান।

একাধিক বিষয়ে দু'টি দেশের মধ্যে সাদৃশ্য এবং পারস্পরিক আদান-প্রদান দু'টি দেশকে করে তুলেছে একে অপরের পরিপূরক। এই প্রক্রিয়ায় নাইজেরিয়া হয়ে উঠেছে ভারতের স্বাভাবিক মিত্র। আফ্রিকার অর্থনৈতিক প্রগতি এবং বিশ্বজুড়ে আফ্রিকার ক্রমবর্ধমান ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করে নাইজেরিয়ার সঙ্গে ভারতের সহযোগিতার মাত্রা বৃদ্ধি প্রয়োজন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নাইজেরিয়া হলো ইকোওয়াস (অর্থাৎ, দ্য ইকোনমিক কমিউনিটি অব ওয়েস্ট আফ্রিকান স্টেটস্) এবং ওপেক (দ্য অর্গানাইজেশন অব দ্য পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিজ)-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলির সদস্য।

গত বছর জি-২০ সম্মেলনে 'অতিথি দেশ' হিসেবে নাইজেরিয়াকে আমন্ত্রণ জানায় ভারত। ভারতের এই নিমন্ত্রণ ছিল নাইজেরিয়ার প্রভাব ও গুরুত্বের প্রতি স্বীকৃতি। নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ টিনুবু ভারতে আয়োজিত এই শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে অব্যাহত রাখার এবং আরও মজবুত করে তোলার এই প্রক্রিয়ায় এবার তাঁর দেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানাতে চলেছেন তিনি। ভারতের দ্বারা প্রচলিত রীতি অনুসরণে এই বছর জি-২০ সম্মেলনে নাইজেরিয়াকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে আয়োজক দেশ ব্রাজিল। আগামী বছর অনুষ্ঠিত হতে চলা জি-২০ সম্মেলনেও এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে পারে আয়োজক দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা।

এইভাবে ঘটে চলেছে বিশ্বমঞ্চে নাইজেরিয়ার উত্থান। বিশ্বনেতৃত্বে অবতীর্ণ হয়েছে ভারত। নেতৃত্বে আসীন ভারতের প্রয়াসে গত বছর 'আফ্রিকান ইউনিয়ন' জি-২০ গোষ্ঠীর স্থায়ী সদস্যপদ লাভ করেছে। নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকায় নাইজেরিয়া সত্যিই অভিভূত। সম্প্রতি নতুন সদস্য দেশ হিসেবে ব্রিকস গোষ্ঠীতে প্রবেশ করেছে নাইজেরিয়া। এর মাধ্যমে একটি নতুন শিখর স্পর্শ করলো নাইজেরিয়া। এই ব্রিকস সদস্যপদপ্রাপ্তি— দেশটির ক্রমবর্ধমান উন্নতির আরও একটি প্রমাণ।

ভারত-নাইজেরিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে প্রস্তুতিপর্ব। এই বছরের জানুয়ারিতে ভারত-নাইজেরিয়া জয়েন্ট কমিশনের বৈঠকে যোগ দিতে নাইজেরিয়া যান ড. এস জয়শঙ্কর। এই বৈঠকের সহ-সভাপতি ছিলেন তিনি। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলা সব পক্ষকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাপর্ব সারেন নাইজেরিয়া সফররত ভারতের বিদেশমন্ত্রী। দু'দেশের মধ্যে থাকা চুক্তিগুলির পর্যালোচনা, নতুন চুক্তি সম্পাদনের মতো বিষয়গুলি দু'দেশের কূটনৈতিক সমঝোতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে সহায়ক হলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে থেকে গিয়েছে নানা চ্যালেঞ্জ। ২০২১-২০২২ আর্থিক বছরে ভারত-নাইজেরিয়া দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ পৌঁছে যায় ১৪.৯৫ বিলিয়ন ডলারে, কিন্তু ২০২৩-২০২৪ আর্থিক বছরে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৭.৮৯ বিলিয়ন ডলার।

কিছুটা আর্থিক ছাড় লাভের কারণে রাশিয়া হতে ক্রুড অয়েল বা অপরিশোধিত তেল আমদানি বাড়িয়েছে ভারত। নাইজেরিয়া হতে তেল আমদানিতে যার প্রভাব পড়েছে। ফলে স্পট মার্কেট (এমন একটি বাজার যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দর কষাকষির মাধ্যমে কোনো পণ্যের মূল্যমান নির্ধারিত হয়) হতে ভারতের দ্বারা নাইজেরিয়ান ক্রুড আমদানির পরিমাণ এই মুহূর্তে অনেকটা কম। এছাড়াও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য কম হওয়ার পিছনে আংশিকভাবে দায়ী চাল আমদানির উপর নাইজেরিয়ার নিষেধাজ্ঞা। যদিও ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পজাত সামগ্রী, ভারতীয় ফার্মা শিল্পে প্রস্তুত ওষুধপথ্য ও প্রসাধন দ্রব্যের মতো নানা পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে নাইজেরিয়ার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে। ডিজিটাল ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি-সহ কৃষি, গ্রিন এনার্জি (পরিবেশবান্ধব শক্তি), স্বাস্থ্য পরিষেবার মতো ক্ষেত্রগুলিও যথেষ্ট সম্ভাবনাময়।

নাইজেরিয়ায় নানা ক্ষেত্রে ২৭ বিলিয়ন ডলার লগ্নির বিষয়ে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নাইজেরিয়ায় ভারতীয় বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি আবশ্যক। উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রেও সহযোগিতার পরিমাণ বৃদ্ধি প্রয়োজন। ২০০টিরও বেশি ভারতীয় কোম্পানি বর্তমানে নাইজেরিয়ায় ব্যবসারত। নাইজেরিয়ায় স্থানীয় কর্মসংস্থানের নিরিখে এই ভারতীয় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি একযোগে সেই দেশে হয়ে উঠেছে— 'বৃহত্তম বিদেশি নিয়োগকর্তা'। এই সবকিছুর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করে তোলার ক্ষেত্রে নাইজেরিয়ায় উপস্থিত ৬০ হাজার প্রবাসী ভারতীয়ের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে সমঝোতা দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভস্বরূপ। নাইজেরিয়ার কাডুনায় অবস্থিত ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি এবং পোর্ট হারকোর্টে নির্মিত ন্যাভাল ওয়ার কলেজ হলো ভারত ও নাইজেরিয়ার মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতার মূলে রয়েছে দুই দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিয়মিত, দ্বিপাক্ষিক আলোচনা, সেনা প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধার লক্ষ্যে গড়ে ওঠা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থার পারস্পরিক বিনিময় এবং নাইজেরিয়ার দ্বারা ভারতীয় প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ক্রয়।

এনএসএ বা জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা স্তরে আলাপ- আলোচনার মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ত্বরান্বিত হচ্ছে দুই দেশের স্ট্র্যাটেজিক কো-অপারেশন বা কৌশলগত সহযোগিতা। সম্প্রতি শেষ রাউন্ডের বৈঠকটির আয়োজক ছিলেন ভারতীয় এনএসএ অজিত দোভাল। অধুনা বিশ্বে সন্ত্রাসবাদ, চরমপন্থা, কট্টরপন্থা ছড়ানোর মাধ্যম হয়ে উঠেছে সাইবারস্পেস (বা অন্তর্জাল-দুনিয়া), আন্তর্জাতিক অপরাধচক্র, অস্ত্র ও মাদকপাচার। সন্ত্রাসবাদ রুখতে, অপরাধচক্র-সহ নানা বিপদ মোকাবিলায় দুই দেশের সহভাগিতাকে দৃঢ় করে তোলার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা ছাড়াও এনএসএ পর্যায়ের শেষ বৈঠকে মেরিটাইম সিকিউরিটি (বা সামুদ্রিক নিরাপত্তা) সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি বাস্তবসম্মত কর্মসূচির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

২০০৭ সালে মনমোহন সিংহ প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন, তাঁর নাইজেরিয়া সফরের সময় দুই দেশের মধ্যে চারটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই সময় দুই দেশ একটি সমঝোতায় উপনীত হয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী পর্যায়ে আরও নয়টি চুক্তি সম্পাদনের বিষয়টিতে একমত হয় দুই দেশ। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নাইজেরিয়া সফরকালে বেশ কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

দুই দেশের শীর্ষ নেতৃত্বকে এবার এই চুক্তিগুলি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি কার্যকরী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এর সঙ্গে প্রয়োজন চুক্তিগুলির বাস্তবায়নের কাজের অগ্রগতির পর্যবেক্ষণ। শীর্ষস্থানীয় বণিকসভাগুলির যোগদানও এই ক্ষেত্রে বিশেষ জরুরি।

সর্বোপরি, ভারত-নাইজেরিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য, এই বিষয়ক পড়াশোনা বা গবেষণার প্রসারের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা কেন্দ্রগুলিকে আর্থিক সহায়তাদান প্রয়োজন। দুই দেশের নাগরিক পর্যায়ে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি, দুই দেশের সাধারণ মানুষদের বৃহত্তর মেলবন্ধন দীর্ঘমেয়াদে উপযুক্ত ফলদায়ী হবে।

(লেখক প্রাক্তন কূটনীতিক এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত)

কলকাতায় হচ্ছে না বাংলাদেশ বইমেলা

কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায়ও ব্রাত্য বাংলাদেশ

জওহরলাল নেহরুর অতিরিক্ত চীন প্রীতি, 'হিন্দি-চীনি, ভাই ভাই' স্লোগানের ফল ভারত পেয়ে গিয়েছিল অচিরেই। ১৯৫০ সালে চীনের তিব্বত আক্রমণ, কিংবা ১৯৬২ সালে ভারতের বিরুদ্ধে চীনের যুদ্ধ— ভারতের বিরুদ্ধে চীনের ধারাবাহিক শত্রুতার মূল্য আজও চোকাতে হচ্ছে দেশবাসীকে। ঠিক একইভাবে দুইপারের বাঙ্গালি এক বলে হিন্দু বাঙ্গালির জাতিসত্তার সুড়সুড়ি দেওয়ার কাজটা শুরু হয়েছিল অনেকদিনই। এতে করে হিন্দু বাঙ্গালিকে শুধু ক্ষুদ্র আঞ্চলিক গণ্ডিতে বেঁধে রাখার কাজটাই সফলভাবে হয়নি, দেশের স্বাধীনতার জন্য বাঙ্গালির গৌরবময় অবদানকে ভুলিয়ে দিয়ে বর্তমানে, ক্ষেত্রবিশেষে দেশের স্বার্থ-বিরোধী পদক্ষেপও নিতে হিন্দু বাঙ্গালিকে প্ররোচিত করা হয়েছে। 'হিন্দি-চীনি ভাই ভাই'য়ের কুফল যেমন দেশবাসী আজকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে, তেমনি আজকের বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার 'ভারত যাদের মামারবাড়ি, বাংলা ছাড়ো তাড়াতাড়ি' স্লোগানের মধ্যে দিয়ে ঠিক একইভাবে বাংলাদেশের বিপদও অনুভব করতে পারছে এপারের হিন্দু বাঙ্গালি।

বইমেলা আয়োজনে অন্তত তেমনি আভাস মিলেছে। একদিকে কলকাতায় যেমন এবার হচ্ছে না 'বাংলাদেশ বইমেলা', তেমনি অন্যদিকে আগামী বছরের আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলায় অংশগ্রহণকারী দেশের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে বাংলাদেশ। ২০১১ সাল থেকে প্রতি বছর কলকাতায় বাংলাদেশ বইমেলা হয়ে আসছে। গত বছরও কলেজ স্কোয়ারের মাঠে এই বইমেলা সাড়ম্বরে আয়োজিত হয়েছিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন বই-প্রকাশক এতে স্টল দিয়ে বহু মুনাফা অর্জন করেন। পক্ষান্তরে ভারতীয় প্রকাশকের ভাঁড়ার শূন্যই থাকে। তাই এই বইমেলা বন্ধে ভারতীয় প্রকাশনার বাজার অর্থনৈতিকভাবে বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বলেই পুস্তক-ব্যবসায়ীদের অনুমান।

অন্যদিকে কলকাতায় পরবর্তী আন্তর্জাতিক বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে আগামী বছরের ২৮ জানুয়ারি থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। গত ১৫ নভেম্বর কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা হয়। এই নির্ঘণ্টের ওপর ভিত্তি করে পরের দিন ভারতীয় সংবাদমাধ্যম 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'র এক প্রতিবেদনে বইমেলায় বাংলাদেশের স্টল থাকা নিয়ে অনিশ্চয়তার কথা বলা হয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, গত ২৮ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার নির্ঘণ্টে অংশগ্রহণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গত, ১৯৯৬ সাল থেকে বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার প্রতিবারই ডাক পায় বাংলাদেশ। ১৯৯৯ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজে এই বইমেলায় যোগ দিয়েছিলেন এবং সেই বছর বাংলাদেশ ছিল কলকাতা বইমেলার থিম কান্ট্রি।

গত বছরের বইমেলাতেও তিন হাজার দুশো ফুট জায়গাজুড়ে তৈরি হয়েছিল বাংলাদেশ প্যাভেলিয়ন। যেখানে অংশ নিয়েছিল ৪৫টি বাংলাদেশি প্রকাশনা সংস্থা। ছিল সেদেশের দশটি সরকারি প্রকাশনা সংস্থাও। এছাড়া বিগত বছরগুলোর মতো গত বছরও ৪৭তম বইমেলা প্রাঙ্গণে পালন হয়েছিল বাংলাদেশ দিবস। পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের সভাপতি ত্রিদিব চ্যাটার্জি বলেছেন, বইমেলায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণের বিষয়ে তারা এখনও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোনো নির্দেশনা পাননি। তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশনা না পাওয়া পর্যন্ত আমরা বাংলাদেশের অংশগ্রহণ সম্পর্কে কিছু বলতে পারছি না। তবে স্থানাভাবের জন্য নতুন কোনো পাবলিশার্সকে স্টল দেওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে বইমেলা কর্তৃপক্ষ।

কলকাতায় 'বাংলাদেশ বইমেলা'র আয়োজক-সভাপতি ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিয়ে যদিও এখনও আশা ছাড়েননি, মুখে বলছেন, 'আমরা অবশ্যই চাই কলকাতা বইমেলায় অংশগ্রহণ করুক বাংলাদেশ। এর জন্য চিঠিও পাঠাব আমরা। সেটা তারা গ্রহণ করবে কিনা, সম্পূর্ণ তাদের ব্যাপার।'

প্রসঙ্গত, বইমেলায় এবারের 'থিম কান্ট্রি' জার্মানি। এখন পর্যন্ত বইমেলায় অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন, পেরু, ইতালি, আর্জেন্টিনা ও কলম্বিয়া রয়েছে। ভারতীয় রাজ্য প্রকাশনা সংস্থাগুলোর মধ্যে দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানা, গুজরাটও এতে অংশ নেবে।

উল্লেখ্য, কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় রাজকীয় আয়োজনে প্রচুর বাংলাদেশির আনাগোনা বাড়ে কলকাতায়। সেই সুযোগে এবারে দুষ্কৃতী তাণ্ডবের আশঙ্কা করেছিলেন তথ্যাভিজ্ঞ মহল। কিন্তু প্রথমত, ভিসা বন্ধ হওয়া, দ্বিতীয়ত, কলকাতায় বাংলাদেশ বইমেলা না হওয়া কিংবা আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ না করায় কলকাতার বুকে কমবে বাংলাদেশিদের আনাগোনা। এতে অনেকটাই দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সুরক্ষিত থাকবে বলে অভিমত বিশেষজ্ঞদের। □

পশ্চিমবঙ্গে বলাৎকার মহামারীর আকার ধারণ করেছে

মানুষ দেখছে যে বামফ্রন্ট থেকে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকারগুলি সর্বদা নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখার জন্য ধর্ষণ ও হত্যার মতো নারকীয় ঘটনাগুলোকে ছোটো করে দেখিয়ে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে থাকে। এই ক্ষমতার রাজনীতির জন্যই আজ সমাজে দুর্বৃত্তরা অবাধে বিচরণ করছে। এর আগেও বাম আমলে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মুখ্যমন্ত্রীদের বলতে শোনা যেত যে, ধর্ষণের মতো ছোটোখাটো ঘটনা তো কতই ঘটে থাকে। মমতা ব্যানার্জিও তার ব্যতিক্রম নয়।

সাধন কুমার পাল

আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা ব্লকের ধনীরামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের গত ১ নভেম্বরের ঘটনা। ছয় বছরের শিশুকে বলাৎকার করে তার দেহ পুকুরে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রমাণ লোপাটের সমস্ত চেষ্টাই করেছিল। কিন্তু তার সেই চেষ্টা শেষপর্যন্ত সফল হয়নি। ওই শিশুর পরিবারের পাশাপাশি প্রতিবেশীদের হাতে সে ধরা পড়ে যায়। প্রতিবেশীরা অভিযুক্তকে আটক করে পুলিশ খবর দেন। তবে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর আগেই বাসিন্দারাই আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে ওই ব্যক্তিকে সুপারি গাছে বেঁধে প্রচণ্ড মারধর শুরু করেন। পুলিশ ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার রেশ এখানেই থেমে থাকেনি। বিভিন্ন এলাকা থেকে বাসিন্দারা অভিযুক্তের বাড়িতে চড়াও হন। নিমেষের মধ্যেই ওই বাড়ির একটি ঘর গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ফালাকাটা থানার আইসি সমিত তালুকদারের বক্তব্য, 'গণপিটুনির জেরে অভিযুক্তের মৃত্যু হয়েছে।' শিশুটির পরিবারের সদস্যদের অভিযোগে রাতে আরেক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২ নভেম্বর আরও এক অভিযুক্ত থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ধৃতের ফাঁসির দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দারা ধনীরামপুরে ছয় ঘণ্টা অবরোধ করেন। বেশ কয়েকটি জায়গায় টায়ার জ্বালানো হয়। রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এদিন মাদারিহাটে নির্বাচনী কর্মসূচি ছেড়ে সন্ধ্যে সাতটায় নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়েছিলেন সমবেদনা জানাতে, সেই সঙ্গে পাশে থাকার বার্তা নিয়ে।

গণপিটুনিতে উত্তেজিত জনতার হাতে এক অভিযুক্তের মৃত্যু প্রমাণ করছে যে রাজ্য পুলিশ ও রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার উপর সাধারণ মানুষের কোনো ভরসা নেই। ধৃত আরেক অভিযুক্তের আদৌ কোনো বিচার হবে, না সে বেকসুর খালাস পাবে তা কিন্তু উপরওয়ালা ছাড়া কেউ বলতে পারবে না। কারণ এক্ষেত্রে মৃত হতভাগিনীর ময়নাতদন্ত হয়েছে সেখানে কোনো ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ছিল না। ঠিক আরজি করের ধাঁচেই এখানেও তড়িঘড়ি ময়নাতদন্ত করে দেহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মিডিয়া রিপোর্ট থেকে জানা গেছে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি সৌরদীপ রায় বলেছেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ছুটিতে রয়েছেন। ময়নাতদন্ত করার জন্য ৩ সদস্যের একটি দল তৈরি করা হয়েছে তারা ময়নাতদন্ত করেছেন। বিষয়টি স্বাস্থ্য ভবনকেও জানানো হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের দৌলতে আরজি কর কাণ্ডের ময়নাতদন্তের নানা গাফিলতি জনসমক্ষে এসেছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে ময়নাতদন্তের খুঁটিনাটি জনসমক্ষে আসার সম্ভাবনা খুবই কম।

পশ্চিমবঙ্গে একের পর এক ধর্ষণ ও খুনের নারকীয় ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু পুলিশ ও তদন্ত সংস্থাগুলির ভূমিকা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই সন্দেহজনক। আরজি কর কাণ্ডের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি অভয়ার মা-বাবাকে টাকা পয়সা দিয়ে কেসটিকে হালকা করার চেষ্টা হয়েছিল। কোনো রকমে ময়নাতদন্ত করে দেহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তদন্তে গাফিলতির জন্য টালা থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডল জেলে আছেন, জেল খাটছেন ওই কলেজের সুপার সন্দীপ ঘোষ নিজে।

এই প্রতিবেদন যখন লিখছি সেই, ১ নভেম্বরের হিসেবে ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে তিনটি ধর্ষণের অভিযোগ সামনে এসেছে। তিনটি জায়গাতেই নির্যাতিতা নাবালিকা। একই দিন পরিবারের এক সদস্যের যৌন লালসার শিকার হলো সাত বছরের শিশুকন্যা। এই ঘটনাটি মুর্শিদাবাদের ডোমকল থানা এলাকায়। অভিযোগের ভিত্তিতে এক

ফঃ ২

মধ্যবয়সি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ২ নভেম্বর দুপুরে আলিপুরদুয়ার জেলারই কুমারগ্রামে নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ সামনে এসেছে। সেখানেও অভিযুক্ত নির্যাতিতার আত্মীয় বলে জানা গিয়েছে। শিশুটিকে নদী থেকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই সমস্ত ঘটনার অভিযুক্তদের শাস্তি হবে কিনা তো উপরওয়ালাই বলতে পারে। এই সমস্ত ঘটনার সবগুলি দুই নভেম্বরের সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল।

কিছু ব্যতিক্রম বাদে আজকাল প্রতিদিনের সংবাদপত্র খুললেই তিন-চারটে এরকম নারকীয় ঘটনার খবর থাকে। তবে ২ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের এই নারকীয় ঘটনাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি খবর বেরিয়েছিল, সেটি উত্তরপ্রদেশের। সেই খবরের শিরোনাম ছিল 'অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড উত্তরপ্রদেশে'। খবরটি এরকম ছিল— 'লখনউ ১ নভেম্বর; সাত বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের পর জলে চুবিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পাথর দিয়ে তার মাথার থেঁতলে হত্যা করেছিল উত্তরপ্রদেশের ইতমাদপুর গ্রামের এক পাহারাদার। ২৩ ডিসেম্বরের ২০২৩-এর ঘটনা। ১১ মাসের মধ্যে রায় আগ্রার পকসো আদালত রাজীব সিংহ নামে ওই পাহারাদারকে মৃত্যুদণ্ড ও ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে।' না, এরকম শিরোনাম পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে ইদানীংকালে চোখে পড়েছে তা মনে পড়ে না।

ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধগুলোকে ধামাচাপা দিয়ে ক্ষমতাসীন দলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার বিকৃত মানসিকতাই আজ পশ্চিমবঙ্গকে নারী নির্যাতনের রাজধানী বানাতে সাহায্য করছে।

রাজ্যে একের পর এক বিরল থেকে বিরলতম নারকীয় ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড ঘটে যাচ্ছে কিন্তু প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই প্রশাসন ঘটনাকে ছোটো করে দেখিয়ে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। আরজি কর কাণ্ডে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন যে তাঁদের কর্মজীবনে তদন্তের কাজে পুলিশের এরকম গাফিলতি, অকর্মণ্যতা আর দেখতে পাননি। শুধু আরজি কর নয়, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তাই হচ্ছে। এ রাজ্যে ধর্ষণের ঘটনা এত বাড়বাড়ন্ত কেন? কেনই-বা প্রতিদিন এত জনকে ধর্ষিতা হতে হচ্ছে? সংবাদপত্র হোক কিংবা ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রতিদিনের খবর ধর্ষণের ঘটনা দিয়ে শুরু হচ্ছে, ধর্ষণের ঘটনা দিয়ে শেষ হচ্ছে। ধর্ষণ সংক্রান্ত অপরাধ এতটা বেড়ে গেছে কেন এই নিয়ে নানান ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হতেই পারে। কিন্তু একটি বিষয় সত্য যে, প্রশাসনের তরফ থেকে কঠোর কোনো বার্তা সমাজে যাচ্ছে না যা থেকে ধর্ষকরা বুঝবে যে রাজ্যে ধর্ষণ করলে পরে আর রেহাই নেই। ধর্ষকের সাজা সাক্ষাৎ মৃত্যু, এই বার্তা কিন্তু প্রশাসনের তরফে কোনোভাবেই যাচ্ছে না। ধর্ষণের ঘটনাগুলির বাড়বাড়ন্ত হওয়ার পিছনে নিশ্চিতভাবে এটাও একটি কারণ। মানুষ দেখছে যে বামফ্রন্ট থেকে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকারগুলি সর্বদা নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখার জন্য ধর্ষণ ও হত্যার মতো নারকীয় ঘটনাগুলোকে ছোটো করে দেখিয়ে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে থাকে। এই ক্ষমতার রাজনীতির জন্যই আজ সমাজে দুর্বৃত্তরা অবাধে বিচরণ করছে। এর আগেও বাম আমলে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মুখ্যমন্ত্রীদের বলতে শোনা যেত যে, ধর্ষণের মতো ছোটোখাটো ঘটনা তো কতই ঘটে থাকে। মমতা ব্যানার্জিও তার ব্যতিক্রম নয়। ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে ধর্ষণের ঘটনাগুলোর দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা না করে জঘন্য অপরাধগুলোকে ধামাচাপা দিয়ে ক্ষমতাসীন দলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার এই বিকৃত মানসিকতাই আজকে পশ্চিমবঙ্গকে নারী নির্যাতনের রাজধানী বানিয়ে দিতে সাহায্য করছে। □

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(যারা ডাকযোগে স্বস্তিকা নিচ্ছেন তাদের জন্য)

যাঁরা শুধুমাত্র ৭০০ টাকা দিয়ে বার্ষিক গ্রাহক হচ্ছেন তাঁদের স্বস্তিকা সাধারণ ডাকের মাধ্যমে নিয়মিত পাঠানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে অনেকেই অভিযোগ করছেন ডাকবিভাগ ঠিকমতো তাঁদের স্বস্তিকা সরবরাহ করছে না। এই কারণেই দু'টি বিশেষ প্রকল্প শুরু করা হয়েছে, যাতে ডাকযোগের গ্রাহকরা নিশ্চিতরূপে তাঁদের স্বস্তিকা পেতে পারেন।

১০৬০ টাকার বিনিময়ে (গ্রাহক মূল্য ৭০০ + ৩৬০ রেজিস্ট্রি খরচ) বার্ষিক গ্রাহক করার একটি প্রকল্প শুরু করা হয়েছে, যাতে স্বস্তিকা নিশ্চিতভাবে গ্রাহকের হাতে পৌঁছায়। এক্ষেত্রে প্রতি মাসের পত্রিকা একত্রে একবার রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

১৫৫০ টাকার বিনিময়ে (গ্রাহকমূল্য ৭০০ + ৮৫০ রেজিস্ট্রি খরচ) বার্ষিক গ্রাহক করার আরও একটি প্রকল্প শুরু করা হচ্ছে, যাতে গ্রাহক তাদের স্বস্তিকা রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রতি সপ্তাহে নিশ্চিতভাবে পেতে পারেন।

বাঙ্গালি বিপ্লবীদের দৃষ্টিতে বিনায়ক দামোদর সাভারকর

বিনয়ভূষণ দাস

গত বেশ কয়েক বছর ধরেই বিপ্লবী, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও আধুনিক হিন্দুত্বের প্রবক্তা বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে হেয় করতে কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট দল তাঁর বিরুদ্ধে লাগাতার অপপ্রচার শুরু করেছে। সাম্প্রতিক এই অপপ্রচার তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী শুরু করেছে ছত্তিশগড়ের এক নির্বাচনী সভা থেকে। ওই সভায় তিনি বলেন, সাভারকর আন্দামানের সেলুলার জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে চিঠি লেখেন। রাহুলের এই বিষোদ্গারের বিরুদ্ধে সাভারকরের নাতি রঞ্জিত সাভারকর মুম্বাই পুলিশের কাছে অভিযোগপত্র জমা দিয়েছে। যদিও তাতে কংগ্রেসের বিষোদ্‌গার থামেনি। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান নেতা ইন্দিরা গান্ধী সাভারকরের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। আবার সাভারকরবিদ্বেষী কংগ্রেসিদের সঙ্গে তুতোভাইয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে বামপন্থীরা। এককালের অহি-নকুল সম্পর্কের কংগ্রেস ও বামপন্থীরা এখন সাভারকর বিরোধিতায় জগাই-মাধই য়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ।

সাভারকর প্রসঙ্গটি তাই বর্তমান সময়ে বিশেষ প্রাসঙ্গিক বলেই মনে করি। আসলে সাভারকরের দুর্নাম রটিয়ে ভারতীয়ত্ব তথা হিন্দুত্বকে কলুষিত করাই কংগ্রেস তথা কমিউনিস্টদের মূল লক্ষ্য। যারা সাভারকর তথা হিন্দু বিরোধিতায় ব্যপ্ত হয়েছেন তারা ওই সময়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত এবং সাভারকরের 'রণকৌশল' বুঝতে সক্ষম হননি। তিনি ছিলেন ভারত ও বিশ্বইতিহাসের একজন মনোযোগী পাঠক। তিনি যেমন ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবোলডি আত্মস্থ করেছিলেন তেমনই মহাভারত, রামায়ণ, পৃথ্বীরাজ-জয়চন্দ্র, শিবাজী, রাজা গণেশ ইত্যাদি ভারতীয়দের ইতিহাসও পাঠ করেছিলেন এক আত্মনিমগ্ন ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে। তিনি ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহকে এক অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন। আর ওইসব ঘটনা থেকে তিনি শিক্ষা নিয়েছিলেন, কখনো কখনো পিছিয়ে আসতে হয়, কখনো শঠকে শঠতাপূর্বকই বিনাশ করতে হয়। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। তিনি ছিলেন ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। শিবাজী যেমন তাঁর ও দেশের শত্রুদের ঠেকাতে চিঠি, আবেদনপত্র পাঠিয়েছেন — কখনো আফজল খাঁকে হত্যার আগে, কখনো-বা আগ্রার বন্দিদশা থেকে মুক্তির জন্য মুঘল বাদশা অত্যাচারী ঔরংজেবকে ঠকাতে। আবার শিবাজী 'পুরন্দরের সন্ধির' অপমানজনক শর্তও মেনে নিয়েছিলেন; কিন্তু যখনই তিনি যথেষ্ট শক্তিশালী হলেন তখনই এই অপমানের প্রতিশোধ নিলেন। ইউরোপে একটা প্রবচন আছে, ভালোবাসায় ও যুদ্ধে কোনোকিছুই অন্যায় নয়। বাস্তবে, এগুলি হলো একটি সফল যুদ্ধ লড়ার কৌশল। আর বুদ্ধিমান, পোড়খাওয়া বিপ্লবী বিনায়ক দামোদর সাভারকর এই পদ্ধতিই গ্রহণ করেছিলেন তাঁর বৈপ্লবিক যুদ্ধে। কারণ তিনি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন, শঠদের শঠতাপূর্বক বিনাশ না করলে বীরত্ব থাকা সত্ত্বেও পৃথ্বীরাজ, রাণাপ্রতাপ, রাজা সীতারামরা হেরে যান, আর পোড়ামাটির নীতি অবলম্বন করে জিতে যান শিবাজী, রাজা গণেশ প্রমুখ নৃপতি। আর তাই বীর সাভারকরও এই পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর কাছে দেশের স্বাধীনতা এবং সমাজের জন্য কাজ করাই ছিল প্রাথমিক লক্ষ্য। সেটাকেই তিনি জীবনের ধ্রুবতারা করেছিলেন। সাভারকরের কাজ বুঝতে গেলে চাই 'সাভারকর মানস', তাই ভালো করে অধ্যয়ন করতে হবে।

সাভারকরের জীবনকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমটি হলো, তাঁর ইংল্যান্ডে গমন ও ইংরাজ দ্বারা গ্রেপ্তার হয়ে ভারতবর্ষে ফিরিয়ে আনার পথে মার্সাই বন্দরে সাঁতার কেটে পালিয়ে যাওয়ার সময়ে আবার গ্রেপ্তার হয়ে দুটি যাবজ্জীবন অর্থাৎ ৫০ বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আন্দামানে বন্দি থাকা। দ্বিতীয়, আন্দামান সেলুলার জেলে এবং রত্নগিরিতে বন্দিজীবন এবং বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে হিন্দু মহাসভার নেতা ও সভাপতি হিসেবে 'হিন্দুত্বের' স্রষ্টা ও নেতা হিসেবে দেশ ও সমাজের জন্য কাজ করা।

ভারতে অবস্থানকালে, ষোলো

বছরের সাভারকর ত্রিম্বক রাও মাউস্কর, রাউজীকৃষ্ণ পাগেকে সঙ্গে নিয়ে নাসিকে ১৮৯৯ সালের নভেম্বরে গঠন করেন 'রাষ্ট্রভক্ত সমূহ' বা The Society of Patriots. সাভারকর এবং ওই তিন যুবক সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতকে শৃঙ্খলমুক্ত করার শপথ গ্রহণ করেন। এই গোপন সংগঠনের সাংগঠনিক জ্ঞান ও কর্মপদ্ধতি নেওয়া হয়েছিল থমাস ফ্রস্টের পুস্তক Secret Societies of the European Revolution, 1776-1887 থেকে। সাভারকরের এই গুপ্ত সংগঠনের কাজ মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। পরের বছর ১৯০০ সালের ১ জানুয়ারি 'রাষ্ট্রভক্ত সমূহ'র এক সভায় সাভারকর প্রস্তাব করেন যে, তাঁদের সংগঠনের 'দ্বৈতসত্তা', দ্বিমুখী কাজের ধরন থাকা প্রয়োজনীয়। একটি হবে নানা উৎসব, মেলা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ্যে কাজ করা আর এইভাবে সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছানো এবং প্রতিভাবান যুবকদের আকৃষ্ট করে

অন্য অংশের মাধ্যমে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য গোপন সংগঠন গড়া। প্রস্তাব অনুযায়ী তিন বন্ধু মিলে গঠন করেন 'মিত্রমেলা' বা Group of Friends। মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতাকামী যুবকেরা দলে দলে এই সংগঠনে যোগদান করে। ইতিমধ্যে বিনায়ক সাভারকর পড়াশোনার জন্য ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি পুনার ফার্গুসন কলেজে ভর্তি হন। ফলে তাঁর কাজের ক্ষেত্রও পালটে যায়। ফার্গুসন কলেজে মিত্রমেলার শাখা স্থাপিত হয় এবং তার মাধ্যমে বিপ্লবের কাজ চলতে থাকে। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে মিত্রমেলার ২০০ সদস্যের উপস্থিতিতে এক সভায় বিনায়ক মিত্রমেলার এক নতুন নাম 'অভিনব ভারত' রাখার প্রস্তাব করেন এবং সর্বসম্মতভাবে সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়। সাভারকরের এই অভিনব ভারত শুধু ভারতবর্ষে নয়, বিদেশেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে সন্ত্রস্ত করে রাখে। ২০০৫ সালে সাভারকর স্নাতক হন এবং একই সঙ্গে এলএলবি ফার্স্ট ডিগ্রিও। এর পরে আইন পড়া সমাপ্ত করতে বোম্বাই যান। সেখানে পড়তে পড়তেই শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা প্রদত্ত শিবাজী স্কলারশিপ নিয়ে লন্ডনে ব্যারিস্টারি পড়তে যান ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে। লন্ডনে তিনি চারটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের একটি, গ্রেজ'ইন (Gray's Inn)-এ ভর্তি হন। সেই সময়ে উচ্চতর পড়াশোনার জন্য সাভারকর ছাড়াও ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, মুহম্মদ আলি জিন্না, জওহরলাল নেহরু প্রমুখ। শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়া হাউসে তিনি থাকতে শুরু করেন। এই ইন্ডিয়া হাউসেই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, জেসি মুখোপাধ্যায়, লালা হরদয়াল, ভাই পরমানন্দ, মাদাম ভিকাজি কামা, ভিভিএস আইয়ার প্রমুখ পরবর্তীকালের বিখ্যাত বিপ্লবীদের। এঁদের সকলেই লন্ডনে ভারতীয় বিপ্লবীদের কেন্দ্রবিন্দু 'ইন্ডিয়া হাউস'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন জওহরলাল নেহরু। লন্ডনে তিনি কোনো বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হননি। লন্ডনে সাভারকরের অভিনব ভারতের কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, ''The society's activities included collection of and training in, arms and explosives wherever and whenever possible. Arms were surreptitiously sent from London by Savarkar when he settled there in 1906. He sent a number of Browning pistols to India with Mirza Abbas, Sikandar Hayat and several others. (The History and Culture of the Indian People, volume–XI, P. 203).

পরবর্তীকালে বিখ্যাত বাঙ্গালি বিপ্লবী ও মানিকতলার মুরারীপুকুর বোমা মামলায় অভিযুক্ত হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো) সাভারকর এবং ইন্ডিয়া হাউসের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হন। এই প্রসঙ্গে সাভারকর তাঁর Inside the Enemy Camp গ্রন্থে লিখেছেন, 'Mr. Das on the other hand was involved in the Maniktola Conspiracy movement in Bengal and had come to London with a specific interntion of learning how to make bombs. Both soon joined my society the Abhinav Bharat. এছাড়া তিনি ওই গ্রন্থে বাঙ্গালি শ্রীঅরবিন্দ, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র দত্ত সম্পর্কেও সশ্রদ্ধ মন্তব্য করেছেন।

ইন্ডিয়া হাউসে অবস্থানকালেই তিনি ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর এই বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের মধ্যে আছে জ্যাকসন হত্যা মামলায় জড়িত থাকা, কার্জন ওয়াইলি হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার মামলা, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও বিস্ফোরক ব্যবহারের ষড়যন্ত্র, বেআইনিভাবে ভারতে অস্ত্র পাচার, ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের উপর পুস্তক লিখে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্বুদ্ধ করা ইত্যাদি। তাঁর এই বিদ্রোহাত্মক কর্মকাণ্ড প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। যখন তাঁকে ইংল্যান্ড থেকে এসএস মোরিয়া জাহাজে ভারতে আনা হচ্ছিল সেই সময়ে এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তিনি। জাহাজের শৌচাগারের জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে

সমুদ্রের মধ্যে গুলিবৃষ্টির ভিতর দিয়ে সাঁতার কেটে ফ্রান্সের মার্সেই বন্দরে উঠেছিলেন যাতে করে তিনি ফ্রান্সের পুলিশের কাছে ধরা দিয়ে ব্রিটিশ পুলিশকে এড়াতে পারেন। কিন্তু ফরাসি পুলিশ তাঁর কথা বুঝতে না পারার সুযোগে ব্রিটিশ পুলিশ জাহাজ থেকে তাড়া করে ধরে ফেলে। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে এই গ্রেপ্তার অবৈধ। ব্রিটিশ পুলিশ ফ্রান্সের মাটিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারে না। এহেন বিপ্লবীকে কেউ কাপুরুষ বলতে পারে?

তাঁকে আন্দামান সেলুলার জেলে বন্দি করে রাখা হয়। তাঁর একই জীবনে দুটি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ঘোষিত হয়। আর এই কারাদণ্ড পরপর ভোগ করার আদেশ দেওয়া হয়, অর্থাৎ একনাগাড়ে পঞ্চাশ বছর তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এর দ্বিতীয় উদাহরণ নেই। তাঁর গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল একটি ব্যাজ যাতে লেখা ছিল কারাদণ্ডের সীমা--- ২৪/১২/১৯১০ থেকে ২৩/১২/১৯৬০। আর ছিল 'ডি' অর্থাৎ ডেঞ্জারাস জেলবন্দি তকমা। তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত , বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তাঁর বিএ ডিগ্রি প্রত্যাহার, ৬ মাসের নির্জন কারাবাস, হাতকড়া পড়ে একনাগাড়ে সাতদিন দাঁড়িয়ে থাকা, পশুর মতো তেলের ঘানি টানা ইত্যাদি মনুষ্যেতর অমানবিক কাজ তাঁকে দিয়ে করানো হতো। শেকলে বেঁধে তাঁকে বেত্রাঘাত করা হতো। এই অবস্থার মধ্যেও লুকিয়েচুরিয়ে সাভারকর বোমা তৈরির চেষ্টা করেছিলেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই কথা জেনে সতর্ক হয়ে পড়ে। এই অবস্থায়, ১৯১৩-র অক্টোবর মাসে ভাইসরয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের হোম মেম্বার (অর্থাৎ ব্রিটিশ-ভারত সরকারের নিরাপত্তা বিভাগের শীর্ষ আধিকারিক) ভারত সরকারের গৃহ সদস্য রেজিনালড এইচ ক্রাডক আন্দামানে সেলুলার জেল পরিদর্শনে যান এবং কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দির সাক্ষাৎকার নিয়ে তাঁদের অভিযোগ জানতে চান। সাভারকর এবং তাঁর সহবন্দি বারীন ঘোষ, নন্দগোপাল, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল এবং সুধীরকুমার সরকারের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় এবং তাঁদের সবাইকে আবেদন করতে অনুমতি দেওয়া হয়। ব্রিটিশ ভারতে এই পদ্ধতির সুযোগ পাওয়ার অধিকারী ছিলেন রাজনৈতিক বন্দির। যেমন তাঁরা কোর্টে নিজেদের পক্ষে সওয়াল করতে পারেন। সাভারকর নিজে আইনবিদ ছিলেন এবং সেইজন্য এই ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে নিজে মুক্ত হতে ও অন্য বন্দিদেরও মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তিনি অন্য রাজনৈতিক বন্দিদেরও বলতেন, প্রত্যেক বিপ্লবীর কাজ হলো ব্রিটিশের হাত থেকে মুক্ত হওয়া এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত থেকে দেশের কাজ করা। ক্রাডক সাভারকর সম্পর্কে তাঁর 23/11/1913-এর রিপোর্টে বলেন, ''He cannot be said to express any regret or repentance.'' বিপ্লবী মদনমোহন ভৌমিক তাঁর বিপ্লবী জীবনের স্মৃতিমূলক গ্রন্থ, 'আন্দামানে দশ বৎসর' গ্রন্থে লিখেছেন ''পুরানো দলের সকলকেই বাহিরে দিয়াছে একথা বলিয়াছি, কিন্তু তাহা নহে। শ্রীযুক্ত গণেশ দামোদর সাভারকর, শ্রীযুক্ত বিনায়ক দামোদর সাভারকর, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস এই তিনজনকে কখনও বাহিরে দেয় নাই, তাঁহারা যতদিন আন্দামানে ছিল ততদিন জেলেই কাটাইয়াছে। এঁদের উপর সরকারের খুব কড়া নজর ছিল।"

সাভারকরের বিপ্লবী যুদ্ধের লক্ষ্য ব্রিটিশ জেলে থেকে পচে মরা নয়, ব্রিটিশদের কাছে পাওয়া সুযোগ কাজে লাগিয়ে জেলমুক্ত হওয়া। তাঁর কথিত 'পিটিশনের' লক্ষ্য সেটাই। তিনি তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ, ''My Transportation for life''-এ লিখেছেন ''It was my duty as a follower of responsive cooperation, to accept such conditions as would enable me to do better and larger work for my country than I was able to do during the years of imprisonment. I would be free thus to serve my mother country, and I would regard it as a social duty.'' (Savarkar, V.D., My Transportation of life, p. 301) এই পুস্তকে তিনি আরও লিখেছেন, ''Whatever good I could do in the Andamans or whatever awakening I might bring about among its people was nothing in comparison with what I could do in India as a free man.'' তিনি কোনো রাখঢাক করেননি তাঁর এই গ্রন্থে। তাঁর উদ্দেশ্য কী ছিল তা পরিষ্কার ব্যক্ত করেছেন। সাভারকর প্রসঙ্গে তাঁর ইংরাজ বন্ধু ডেভিড গারনেট তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ''I could not endure seeing a man with such intense vitality spending his life in prison.'' (Garnett, David, The Golden Echo Harcourt, Brace and Company, New York).

সাভারকর কখনো লুকোননি যে তিনি সরকারের কাছে চিঠি, পিটিশন ইত্যাদি করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর গ্রন্থ, 'My Transporation for life' গ্রন্থে সব খোলাখুলি লিখেছেন এবং এগুলির পিছনে তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কী ছিল সেটাও ব্যক্ত করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর রাজনৈতিক সহবন্দিরা মুক্তি পাক। তিনি নিজে কখনো তাঁর কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাননি। তিনি তাঁর ওই

গ্রন্থে লিখেছেন, ''I offered to do without any release for myself personally. Let them release all the political prisoners in the country leaving me alone in my cell in the Andamans. I shall rejoice in their freedom as if it was my own.'' (p. 187)। বাস্তব ঘটনা হলো, আন্দামানের অধিকাংশ রাজনৈতিক বন্দি এই ধরনের শর্তাবলী স্বীকার করে চুক্তিতে স্বাক্ষর করে মুক্তি পেয়েছিল ১৯২০ সালে। ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট নেতা হো-চি-মিন এই একই ধরনের পিটিশনে স্বাক্ষর করে পাঠিয়েছিলেন কুয়ো-মিন-তাং সরকারের প্রধান মার্শাল চ্যাঙের কাছে যাতে তিনি তাঁর বিরোধী (অর্থাৎ মার্শাল চ্যাঙ-এর বিরোধী) করতে ডং-মিনহ-হই-এর জন্য কাজ করতে স্বীকৃত বা রাজি হন। (Kanitkar, V. G. Vietnam : Interpretation & Disaster, 1998, p. 53)। এই প্রসঙ্গে আন্দামান ফেরত কিছু বাঙ্গালি বিপ্লবীর আত্মজীবনী ও স্মৃতিচারণ থেকে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। বিখ্যাত বিপ্লবী হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো) বোমা তৈরি শিখতে লন্ডনে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকরের সঙ্গে। তিনি সাভারকরের অভিনব ভারত সংস্থায় যোগদান করেছিলেন। হেমচন্দ্র দাস তাঁর আত্মজীবনী, 'বাঙ্গলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা' গ্রন্থে সাভারকর সম্পর্কে লিখেছেন, 'বিনায়ক বিলেত যাবার আগেই রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে নেতৃত্বের তালিম পেয়েছিলেন। তাই লন্ডনে গিয়েই গুপ্তসমিতি গঠন করতে উঠে-পড়ে লাগলেন। এইটিই বোধহয় ভারতের বাইরে প্রথম ভারতীয় বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতি। তিনি আরও লিখেছেন, 'সুপুরুষ বলতে যা বোঝায়, ইনি তাই ছিলেন। মুখের ভাবটি খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচায়ক। এই মুখের একটা এমন আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, প্রথম দৃষ্টিতে লোককে আপনজন করে ফেলতে পারতেন। দু-চার কথায় লোকের মনোরঞ্জন করবার বিদ্যাও তাঁর আয়ত্ত ছিল। .....ইন্ডিয়া হাউসে আমার সঙ্গে প্রথম দর্শনেও তিনি তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলাম কিনা মনে নেই, কিন্তু তথাপি তাঁর ভক্ত হয়েছিলাম।' অবশ্য শুধু হেমচন্দ্র দাসই নন, অন্যান্য আন্দামান ফেরত বাঙ্গালি বিপ্লবীও তাঁর সম্পর্কে সশ্রদ্ধ মন্তব্য করেছেন ও তাঁর বিপ্লবী জীবনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। প্রখ্যাত বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী তাঁর 'জেলে ত্রিশ বছর' গ্রন্থে বিপ্লবী সাভারকরের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করে লিখেছেন, ''সাভারকর বাবু বিভিন্ন দফায় ৫৬ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আন্দামানে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয়। তিনি ছিলেন সুবক্তা, সুলেখক, সংগঠন ক্ষমতা ছিল অদ্ভুত। আন্দামানে সেলুলার জেলে তাঁহার সহিত একত্র থাকার সুযোগ ঘটায় তাঁহার সংগঠন শক্তির পরিচয় পাইয়াছি।" আর প্রখ্যাত বিপ্লবী এবং পরবর্তীকালে বামপন্থী নেতা এবং আন্দামান ফেরত বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় তাঁর 'ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব' গ্রন্থে বীর সাভারকরের ভূয়সী প্রশংসা করে লিখেছেন, ''বিনায়ক সাভারকর তাঁর জীবনসায়াহ্নেও যে খাঁটি 'বিদ্রোহী' ছিলেন তার পরিচয় এখানে দেবো। আমরা জানি, নেতাজী এই বৃদ্ধ বিদ্রোহীর অক্লান্ত তারুণ্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন। তাই তাঁর মতামত জানতে গিয়েছিলেন তিনি দেশ থেকে পালাবার পূর্বে। সাভারকর মন দিয়ে শুনেছিলেন সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব। দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুযোগ নেবার যে সংকল্প তিনি করেছিলেন, তা সাভারকরের সাগ্রহ সমর্থন লাভ করেছিল। সাভারকর অনুমোদন না করলেও নেতাজী সে সুযোগ নিতেন। সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল যে, অতি প্রাচীন সাভারকর এবং অতি তরুণ সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারা একই গতিবেগে তখনো প্রবাহিত ছিল। ১৯০৬ সালের সাভারকর ১৯৪০ সালেও 'ইস্পাতের মত তীক্ষ্ণ' ঝকঝকে বিদ্রোহী মনের অধিকারী ছিলেন বলেই তরুণ সুভাষ, আগামী কালের বিপ্লবী মহানায়ক 'নেতাজী' সংগোপনে পরামর্শ চাইতে গেলেন তাঁরই কাছে— ভারতের অন্য কোনো নেতার কাছে নয়।

সাভারকর চির-বিদ্রোহী। সাভারকর চির-তরুণ। ভারতবর্ষের সৌভাগ্যবিধৃত-ললাটে দুলতে থাকা উজ্জ্বল রত্নে দুটি ভাই। (পৃষ্ঠা-৫০)

বীর সাভারকর সম্পর্কে এর চেয়ে বড়ো প্রশংসা বাক্য আর কী হতে পারে।

বেশিরভাগ পুরনো কমিউনিস্ট নেতারা বীর সাভারকরের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট নেতা হো-চি-মিন ভারতের কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ ইএমএস নাম্বুদ্রিপাদ, এমএন রায়, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে প্রমুখ বিপ্লবী হিসেবে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন সাভারকরের। তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে সাভারকর সম্পর্কে বলেছিলেন, ''The death of Veer Savarkar removes from the scene of India history one of the great anti-imperialist revolutionaries.'' দেখা যাচ্ছে, শ্রীডাঙ্গে সাভারকরকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এক বিপ্লবী হিসেবেই দেখেছেন। সমাজবাদী নেতা ডঃ রামমনোহর লোহিয়া তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছিলেন, 'All those who lived in India were Hindus whatever their religion.' সিপিআই নেতা অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁকে 'আধুনিক ভারতের অন্যতম নির্মাতা' বলে অভিহিত করেন।

সাভারকরের জীবনীকার ধনঞ্জয় কীরের মতে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর সঙ্গে তাঁর মুম্বাইয়ের বাসবভবন 'সাভারকর সদনে' ২৩ জুন, ১৯৪০ দেখা করে হিন্দু মহাসভা ও ফরোয়ার্ড ব্লক কীভাবে পরস্পর সহযোগিতা করতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করেন। সাভারকর সুভাষচন্দ্র বসুকে ভারত ছেড়ে যেতে এবং জাপান ও জার্মানের সহযোগিতায় আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করার পরামর্শ দেন। গান্ধীজী তাঁর মত ও পথের তীব্র বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও Young India-য় লিখেছিলেন, ''A faithful son of Bharat, brave, clever and....frankly a revolutionary.'' চরমপন্থী স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতৃত্রয় লাল-বাল-পাল ত্রয়ীর অন্যতম নেতা লালা লাজপত রায় তাঁর Young India গ্রন্থে সাভারকর সম্পর্কে লিখেছেন, Savarkar had extremely fine qualities of a leader. He was caught because he was reckless; he never cared about his personal safety; he had the dash of the old warrior who always put himself in the post of danger. (p. 171)

বীর সাভারকর একমাত্র বিপ্লবী, স্বাধীনতা সংগ্রামী যিনি নতুন ভারতের জন্য দিয়ে গেছেন এক নতুন আদর্শ, হিন্দুত্বের আদর্শ, 'হিন্দুরাষ্ট্র দর্শনের' নতুন চেতনা, এক নতুন ভাবাদর্শ। নতুন ভারত গঠনের লক্ষ্যে তাঁর প্রদর্শিত পথ হলো— 'হিন্দু জাতির একত্রীকরণ, একত্রিত জাতির সামরিকীকরণ এবং সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণ'। বিরোধীদের শত কালিমালেপন চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি একজন বীর বিপ্লবী, এক ক্ষুরধার ধীসম্পন্ন তাত্ত্বিক নেতা হিসেবে ভারতবাসীর হৃদয়ে অমর হয়ে থাকবেন। ▯

চট্টগ্রাম ভারতের আজকে এই দাবি যুক্তিসঙ্গত

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পালাবদলের পরপরই প্রধান উপদেষ্টা ড. মহম্মদ ইউনুস ভারতের প্রতি আঙ্গুল তুলে সেভেন সিস্টার অশান্ত করে তুলবেন বলে সুর চড়িয়েছিলেন। তারপরই অবস্থা বেগতিক বুঝে অনেকটা ভেজা বিড়ালের ভূমিকায় এসে ভোল বদলে বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী বলে ভারতের মন গলাতে চেয়েছেন। এইসব ভনিতা আমরা বুঝি। তাঁর সেই কথায় আমাদের মনে দাগ কেটেছে। মনে হয়েছে তিনি রাজনীতির প্রথমপাঠ নিচ্ছেন। নিজের দেশ সামলাতে না পেরে অনেকটা পাগলের প্রলাপ বকতে গিয়ে মুখ থেকে মনের কথা বের হয়েছিল সেদিন। তার উত্তরে ভারত কিন্তু অনেক কথাই বলতে পারতো। কিন্তু ভারত এই শিশুসুলভ রাজনীতিকের কথাকে আমল দেয়নি। বরং ভারত যুক্তিযুক্তভাবে চট্টগ্রামকে তার নিজস্ব ভূমি দাবি করতে পারতো। কিন্তু, ভারত সেটি করেনি। কারণ ভারত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নয়। তবে, ১৯৪৭ সালেই চট্টগ্রাম দাবি করা উচিত ছিল ভারতের। হচ্ছিলও তাই। জওহরলাল নেহরুর চালাকির অন্তরালে লুকিয়ে থাকা ষড়যন্ত্র এবং মুসলমান জনগোষ্ঠীকে খুশি করার লক্ষ্যে তাঁর কুটচাল সেদিন ভারতবাসী বুঝেছিল ঠিকই। হিন্দুরক্ত কোমল এবং সেটা খুব সহজে গরম হয় না সেটা প্রমাণিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় হাতে গোনা মুসলমানের বসবাস ছিল। কোন কারণে এই বেইমানি করলেন তিনি তা আমাদের কাছে এখন স্পষ্ট। যেহেতু ধর্মভিত্তিক দেশ ভাগ হয়েছে, সে যুক্তিতেই চট্টগ্রাম ভারতেরই অংশ। এইটাই সত্য কথা।

১৯৪৭ থেকে ২০২৪ হিন্দুরা বাংলাদেশে শুধুই জীবন দিয়েছে। সম্পদ হারিয়েছে। পৈতৃক ভিটেমাটি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। এখন জওহরলাল নেহরুর এক ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করছে হিন্দু নামধারী মানুষেরা। সূর্যসেন, প্রীতিলতার ভূমি রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। মৃতদেহের পাহাড় উঁচু হয়েছে। চাকমা, বৌদ্ধ ও ত্রিপুরীদের উপর নির্বাচারে চলে আসছে অত্যাচার। এবার সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সেনাবাহিনীও নেমেছে ঘৃণ্যতম হত্যাকাণ্ডে। সরাসরি সংখ্যালঘুদের মারধর করা হচ্ছে। প্রশাসন চুপ হয়ে আছে। ইউনুস সরকার মুচকি হাসি হাসছে। তিনি কি জানেন, সম্প্রতি দাবি উঠেছে চট্টগ্রাম ভারতের হোক। এই দাবি ন্যায্য। জাগছে হিন্দুরা, কেঁপে উঠেছে ইউনুস সরকার। থরহরিকম্প এখন বাংলাদেশ। সূর্যসেন প্রীতিলতার রক্ত হতে জন্ম নিয়েছে লক্ষ লক্ষ সৈনিক। রাম নামে জেহাদিদের বড়ো ভয়। রামগড়ের নাম পরিবর্তন করে করা হয়েছে খাগড়াছড়ি। সারা বিশ্বের বিবেক জেগে উঠেছে সেখানকার হিন্দু, বৌদ্ধ, ত্রিপুরি ও চাকমাদের হত্যা দেখে। তবে, আর কতো? এবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে চট্টগ্রাম। ঘুরে দাঁড়িয়েছে সারা দেশের হিন্দুরা। প্রতিবাদ চলেছে বিশ্বজুড়ে। ঢাকার সাহবাগ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে প্রতিবাদের ঝড়ে। তার প্রভাব লেগেছে ত্রিপুরায়ও। ত্রিপুরার রাজপরিবারের বীর সন্তান প্রদ্যুৎ কুমার দেববর্মন জনসভা করে প্রতিবাদ করেছেন। তার সময়োচিত সাহসী বার্তা সেখানকার নির্যাতিতদের উজ্জীবিত করেছে। তার এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক ও প্রশংসার দাবি রাখে। আমরা তাকে সম্মানের সঙ্গে সাধুবাদ জানাই।

ধর্মভিত্তিক বিভাজনের সময় চট্টগ্রামে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০ শতাংশ। কিন্তু কীসের যুক্তিতে সে অঞ্চলকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি? ইতিহাস তার সাক্ষী রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক অনেক তথ্য লোপাট করা হয়েছে। কিন্তু মানুষের মন থেকে মুছে দিতে পারেনি সে ইতিহাস। ইতিহাস সবসময় সাক্ষী হয়েই থাকে। দেশ বিভাগের আজ ৭৭ বছর পরেও পার্বত্য চট্টগ্রাম কেন, কীভাবে ভারতের না হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অংশে পরিণত হলো তার অনেক ঘটনাপ্রবাহ ও তথ্য সময়ের কাছে প্রশ্ন করে চলেছে। সময়ই তার উত্তর দেবে ঠিক সময়ে। চাকমাজনজাতির স্বনামধন্য রাষ্ট্রদূত প্রয়াত মুকুর কান্তি খিসার

লেখা 'অল দ্যাট গ্লিটার্স'-এ বিষয়ে একটি বড়ো ঐতিহাসিক দলিল। ১৯৪৭ সালের 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স অ্যাক্ট'-এর প্রথম পরিকল্পনায় নতুন প্রদেশ পূর্ববঙ্গে বঙ্গের কোন কোন জেলা অন্তর্ভুক্ত হবে তার একটা তালিকা ছিল। সেখানে স্পষ্ট লেখা ছিল যে, চট্টগ্রাম বিভাগে চট্টগ্রাম জেলা, নোওয়াখালি এবং তিপেরা অর্থাৎ বর্তমান কুমিল্লার নাম। দেশ বিভাগের মৌলিক আইন খুবই পরিস্কার ছিল। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পাকিস্তান আর অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ভারতের থাকবে। তাহলে হিন্দু প্রাধান্য ভূখণ্ড কেন ভারতের হলো না?

১৯৪৭ সালের আগস্টে, দেশ বিভাগের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের অমুসলমান জনসংখ্যা ছিল ৯৮.৪ শতাংশ মাত্র। আর মুসলমান জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১.৫ শতাংশ। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে ভারতের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে মাউন্ট ব্যাটেনকে তার কৃতিত্বের জন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে মনে করা হলেও তিনি ছিলেন খুবই ব্যস্ততার মধ্যে। তার লক্ষ্যও ছিল দেশভাগের মতো একটি বিশাল কর্মকাণ্ডকে দ্রুত সম্পন্ন করা। দেশ বিভাগের প্রধান নীতিকে উপেক্ষা করে চট্টগ্রামকে আড়াল করার ষড়যন্ত্রে ভারতের জওহরলাল নেহরুকে নির্দোষ বলা যাবে না। ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশের শেষ রাজপ্রতিনিধি ভাইসরয় হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের আগেই তিনি রাজা ষষ্ঠ জর্জকে (যিনি তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়) শর্তারোপ করেন যে— 'আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজি একমাত্র শর্তে যে, ১৯৪৮ সালের জুলাইয়ের মধ্যেই ভারতকে স্বাধীনতা দিতে হবে এবং আমি তার একদিনেরও বেশি সেখানে থাকব না'। মাউন্ট ব্যাটেন ভারতে আসেন ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে এবং দেশ বিভাগের বিশাল এই কাজ সম্পন্ন করতে তার হাতে ছিল প্রায় ১৬ মাস। অথচ তিনি সেই কাজ শেষ করেন ১৯৪৭ সালের আগস্টের ১৫ তারিখ অর্থাৎ মাত্র ৫ মাসের মধ্যে। যার জন্য তাকে যথেষ্ট কৃতিত্বও দেওয়া হয়। তখন সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের প্রতিনিধি ভিপি মেনন পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে জেনে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন কমিশনের সনদে। ১৩ আগস্ট সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটিও বিষয়টি উত্থাপন করে এবং উল্লেখ করে যে, কমিশনের সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক, বিচারহীন, সামঞ্জস্যহীন ও অর্থহীন। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হওয়া উপযোগী নয়। মাউন্ট ব্যাটেনকে লিখিত চিঠিতে সর্দার প্যাটেল রুষ্টভাবে উল্লেখ করেন— 'কমিশনের সিদ্ধান্ত বেআইনি ও শর্তের পরিপন্থী। আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষদের আহ্বান করছি তারা যেন পাকিস্তানভুক্তিকে বলপূর্বক প্রতিহত করে'। মাউন্ট ব্যাটেন আশঙ্কা করছিলেন নেহেরু স্বাধীনতা উদ্‌যাপনের দিনটিকে বয়কট করবেন, ভারত বিভাজন কোনো শান্ত পরিস্থিতির মধ্যে না হয়ে হবে চরম বিদ্রোহ ও হিংসার মধ্য দিয়ে। তাই মাউন্ট ব্যাটেন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ১৫ আগস্ট কমিশনের সনদটি ঘোষণা করবেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে সর্দার প্যাটেলের ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া দেখে মাউন্ট ব্যাটেন নিজেই আশ্চর্য হয়েছিলেন। স্মৃতিচারণায় মাউন্ট ব্যাটেন লিখেছেন, 'একজন প্রকৃত রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে আমি যে ব্যক্তিকে সম্মান করতাম, দেশের মাটিতে যার শক্ত ভিত্তি রয়েছে এবং যিনি বলিষ্ঠ কথার মানুষ সমধিক সম্মানিত তিনি যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকেন তা হবে খুবই অন্যায়। একটি সামান্য বিষয়ে নিভৃতে এমন ভয়ংকর সংকট যদি সৃষ্টি হয়ে যায় তথাপি জরুরি বড়ো বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করতে গিয়ে কোনো অবস্থাতেই যাতে সেই ব্যক্তিত্ব গর্জে না ওঠে তা অনুধাবন করতে বেশ কিছুদিন ভারতে কাটাতে হয়েছিল আমাকে'। বাউন্ডারি কমিশনের মুসলমান সদস্য মহম্মদ মুনিরও বলেন— 'আমি শুরু থেকেই নিশ্চিত ছিলাম যে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতে অন্তর্ভুক্ত হবে'।

পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা নিঃসন্দেহে নীতিগতভাবে একটি অবিচার, শর্তের পরিপন্থী ও অন্যায়। ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউন্ট অ্যাসেম্বলির সাব কমিটির মেম্বার মি. জয়পাল সিংহ যিনি ভারতের (শাসন বহির্ভূত অঞ্চল) এক্সক্লুডেড এরিয়াগুলি নিয়ে কাজ করছিলেন, তিনি লিখেছেন— 'পার্বত্য চট্টগ্রামকে অবশ্যই ভারতের ফেরত চাইতে হবে'। পরবর্তীতে কিছুদিনের মধ্যে কলকাতায় এক ভাষণে নেহরু নিজেই বলেছেন— 'পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে গুরুতর অন্যায় করা হয়েছে'। তিনি আরও ঘোষণা করেন, বিষয়টি নিয়ে পাকিস্তানের কাছে উত্থাপন করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে কিছুই করেননি তিনি। বরং ধীরে ধীরে বিষয়টি মানুষের মন থেকে সরিয়ে দেওয়ার কাজটি তিনি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছিলেন। অনেকে তার এই ভূমিকাকে প্রতারণার শামিল আখ্যা দিয়ে দেশদ্রোহী হিসেবেই দেখতে চেয়েছেন। স্পষ্টত নেহরুর এই গোপন অভিপ্রায় পাকিস্তানি এবং মুসলমানদের ইন্ধন জুগিয়েছে।

অথচ মুকুর কান্তি খিসা আরও উল্লেখ করেন, 'আমরা তবুও আমাদের প্রতিনিধি দিল্লিতে পাঠিয়েছিলাম আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা জানাতে, আমাদের দাবির কথা বলতে। সর্দার প্যাটেল তাদের স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং মনোযোগের সঙ্গে তাদের কথা শুনেছিলেন। তিনি পরামর্শও দিয়েছিলেন যা শক্তি আছে তা দিয়ে পাকিস্তানে চট্টগ্রামের অন্তর্ভুক্তিকে প্রতিরোধ করার জন্য। সর্দার প্যাটেল প্রতিনিধিদলকে বলেছিলেন, এই মুহূর্তে কাশ্মীর, হায়দরাবাদ ও জুনাগড় নিয়ে আমি পুরোপুরি ব্যস্ত রয়েছি। এই সমস্যাগুলি সমাধান করার পর আমি কথা দিচ্ছি যে আমি আপনাদের উদ্ধার করতে এগিয়ে আসব'। বড়োই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, ১৯৫০ সালের ১৫ ডিসেম্বর সর্দার প্যাটেলের আকস্মিক জীবনাবসানে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষদের আবেদন পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে রইল ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। আর এভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রামের অসহায় মানুষদের প্রতি সীমাহীন অবহেলা, অত্যাচার, নির্যাতন, গণহত্যার শুরু।

এখন উপযুক্ত সময় এসেছে আমাদের ভূমি আমাদের বুঝে নেওয়ার। সহনশীলতার সীমানা ছাড়িয়ে গেছে অনেক আগেই। আর কত হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ত্রিপুরীরা প্রাণ দেবে? আর কত রক্ত দেবে তারা? অমুসলমান হওয়া যদি তাদের অপরাধ হয়ে থাকে, তাহলে শেষবারের মতো বোঝাপড়া করার এটাই সময়। বারবার আঘাত, বারবার নির্যাতন, সম্পদ ধ্বংস করা, নারীনিগ্রহ যে জাতির রক্তে মিশে আছে তাদের সঙ্গে আর কোনো করুণা ও সহনশীলতা নয়। কৃতজ্ঞতা জানাই ত্রিপুরা রাজপরিবারের সাহসী সন্তান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণকে। তিনিই প্রথম চট্টগ্রামের ন্যায্য দাবি নিয়ে সরব হয়েছেন। □

ইসলামে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’র স্থান নেই

ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি কথাগুলি সেখানেই প্রযোজ্য যেখানে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। বহুদিন ধরে রাষ্ট্রচেতনাসম্পন্ন মানুষরা এই কথা বলে আসছেন। একথা প্রমাণিত সত্য যে, কোনো স্থানে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালে সেখানে কথাগুলি অচল। বিশ্বের কোনো ইসলামি দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা নেই। একথা আবার প্রমাণিত হলো বাংলাদেশে। বাংলাদেশের ইউনুস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার বাংলাদেশের হাই কোর্টে বলেছে, বাংলাদেশে এখন ৯০ শতাংশ মানুষ মুসলমান। তাই এদেশে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ শব্দটির আর প্রয়োজন নেই। তারা ‘সমাজতন্ত্র’ শব্দটি বাদ দেওয়ার পক্ষেও সওয়াল করেছে। ভারতের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও তৃণমূল নেতাদের এই সত্যটি অনুধাবন করার সময় এসেছে। ভারতে যেভাবে দ্রুতহারে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে এক অশনিসংকেত। ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ শব্দটির আড়ালে ও তথাকথিত রাজনৈতিক দলগুলির সীমাহীন মুসলমান তোষণেই যে এই দেশ বড়ো বিপদের দিকে এগিয়ে চলেছে তা দিবালোকের মতো পরিষ্কার।

—**সুমন সাহা,**
বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ।

ধর্ম ও রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ক্ষয়িষ্ণু গণতন্ত্র

মানুষের মূল্যবোধ ধর্মই নিরূপণ করে। অর্থাৎ, মানব সভ্যতার মূলে ধর্ম। ধর্ম যদি অক্ষত থাকে, তবে সমাজ-দেহের অঙ্গগুলি সুস্থ ও সুন্দর থাকবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন— ‘হিন্দুধর্মকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসাতে হবে হিন্দুদেরই। সমাজের বর্তমান দুর্দশার জন্য ধর্ম দায়ী নয়। বরং সমাজে ধর্মের যথাযথ প্রয়োগের অভাবই দায়ী। এই সিদ্ধান্তের যথার্থতা আমাদের প্রাচীন গ্রন্থগুলি হইতে আমি প্রমাণ করিতে প্রস্তুত। ভারতে কোনো বিষয়ে উন্নতি করিতে গেলে প্রথমে চাই ধর্মের অভ্যুত্থান।’ এই ধর্মকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। জাতির কল্যাণের জন্য পরস্পরের মধ্যে মতভেদ এবং অবাঞ্ছিত কলহ থাকলে চলবে না। বর্তমানে আমাদের দেশে বিশেষ প্রয়োজন এরকম বলিষ্ঠ মানুষের। বহু দিকে বিস্তীর্ণ আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের সম্মিলন দ্বারাই ছুৎমার্গ দূরীভূত করে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অন্যদিকে ধর্মের ন্যায়াদর্শকে উপেক্ষা করে বিচার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ধর্মের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। ধর্মের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু সাধনার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। শুধু তাই নয়, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, দর্শন প্রভৃতির উৎকর্ষের মূলেও ধর্মের প্রভাব অনস্বীকার্য।

—**রবীন্দ্রনাথ রায়,**
সাহেবের হাট, রাশিডাঙ্গা-২।

ইডির তল্লাশি লটারি মাফিয়াচক্রের পর্দাফাঁস

গত ১৪ ও ১৫ নভেম্বর বিভিন্ন রাজ্যের প্রায় ২০টি জায়গায় চললো এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি হানা। তার মধ্যে কলকাতার তিনটি জায়গায় হানা দিল ইডি। ইডি তল্লাশির ফলে কুখ্যাত ‘লটারি কিং’ স্যান্টিয়াগো মার্টিনের ‘ডিয়ার লটারি’ নামক মাফিয়াচক্রের পর্দাফাঁসের সাক্ষী থেকেছে রাজ্যবাসী। কেরালা, তামিলনাড়ু ও সিকিমের বিভিন্ন জায়গা ছাড়াও দক্ষিণ কলকাতার লেক রোড দু'টি ঠিকানা এবং উত্তর ২৪ পরগনার মাইকেল নগরের একটি গুদাম— মোট তিনটি স্থানে দিনভর তল্লাশি চলে। তল্লাশি অভিযান চলাকালীন লেক রোডের ঠিকানায় এত পরিমাণ নগদ অর্থ মিলেছে যে ইডিকে টাকা গোনার যন্ত্র আনতে হয়। প্রায় ৩ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর। মাদ্রাজ হাইকোর্টের নির্দেশে ২০১২ সালের একটি তদন্ত পুনরায় শুরু করেছে ইডি। সেই মামলায় মানি লন্ডারিং বা অর্থ পাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত ছিল লটারি মাফিয়া স্যান্টিয়াগো মার্টিন। মাদ্রাজ হাইকোর্টের সাম্প্রতিক নির্দেশের জেরে কোয়েম্বাটোরে মার্টিনের বাড়ি ও অফিস-সহ চেন্নাইয়ের বিভিন্ন ঠিকানায় হানা দেয় ইডি। পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের মার্টিন যোগ বহুদিন আগে থেকেই সামনে এসেছে। এই শাসক দল চিটফান্ডগুলিতে গরিব মানুষের সঞ্চিত টাকা লুঠ করেছে। গোরু-বালি-কয়লা পাচার করে বিপুল অর্থ অর্জন করেছে। সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বড়ো অঙ্কের দুর্নীতি করেছে। রেশন-দুর্নীতি, স্বাস্থ্য দুর্নীতি, আমফানের চাল, ত্রিপল লুঠ-সহ সরকারি চাকরি বিক্রি করে বিপুল অর্থ তুলেছে এই রাজনৈতিক মাফিয়া চক্র। এমনকী টাকা রাখার ক্ষেত্রে কয়লা ভাইপোর বিদেশি বান্ধবীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পর্যন্ত ব্যবহৃত হচ্ছে বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

গরিব মানুষ সাধারণত লটারির টিকিট কিনে থাকেন। বঙ্গশ্রী, বঙ্গভূমি, বঙ্গলক্ষ্মী, গৃহলক্ষ্মী, ধনলক্ষ্মীর মতো রাজ্য সরকারের নিজস্ব লটারি বন্ধ করে শাসক দলের মদতে রাজ্য জুড়ে ডিয়ার লটারির রমরমা হয়েছে। নিম্ন আয়সম্পন্ন গরিব মানুষ লটারির টিকিট কেটে সর্বস্বান্ত হলেও রাজ্যের শাসক দলের নেতারা, তাদের পরিবারের লোকজন একের পর এক লটারির পুরস্কার জিতেছেন। ডিয়ারের মালিক ইলেক্টোরাল বন্ডে এই রাজনৈতিক দলটিকে প্রায় ৬০০ কোটি টাকা দিয়েছে বলেও খবর। রাজ্য জুড়ে লটারি দুর্নীতির এই পর্দাফাঁসের পর সাধারণ মানুষের আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন। চরম দুর্নীতিগ্রস্ত শাসক দলের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সর্বাত্মক প্রতিবাদ- প্রতিরোধ গড়ে তোলা আজ সময়ের দাবি।

—**অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়,**
খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা।

ফঃ ৩

শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের বাংলাদেশের হিন্দুদের পাশে থাকতে হবে

দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশে যে অস্থির অবস্থা চলছে, তা দিন প্রতিদিন আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। যেখানে গণতন্ত্রই নেই সেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদ কতটা কার্যকরী হবে, সেটা কেউই বলতে পারবে না। বর্তমানে শরিয়তি ব্যবস্থা প্রচলনের পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তাও হিন্দুদের জন্য উদ্বেগজনক। এই অস্থিরতার প্রতিরোধে হিন্দুদের সক্রিয় প্রচেষ্টা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। তবে যেখানে সংঘর্ষ দেশের অভ্যন্তরেই সরকারের সঙ্গে, সেক্ষেত্রে আরও দৃঢ় প্রতিরোধের প্রয়োজন রয়েছে, হয়তো আজ তা করছেও। কিন্তু তাদের পাশে থাকার বার্তা ভারত সরকার-সহ আপামর হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে হওয়া প্রয়োজন। ব্যক্তিগতভাবে বা সাংগঠনিকভাবে বাংলাদেশের পরিস্থিতি জনসমক্ষে তুলে ধরতে হবে। কোনো একজন নোবেলজয়ী বিশ্ব দরবারে যে মিথ্যা প্রচার করছে, তা বন্ধ করতে ও সঠিক তথ্য প্রকাশ করতে হবে। যাতে আন্তর্জাতিকভাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বা মানবাধিকার কমিশনের মতো সংগঠনগুলি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

—**নিরঞ্জন দাস,**
সাহাপুর, মালদা।

উজ্জয়িনী নামের নেপথ্যে

মহাকালেশ্বর ও কালিদাসের উজ্জয়িনী। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উজ্জয়িনী। মধ্যপ্রদেশ অন্তর্গত বিখ্যাত নগরী ও তীর্থস্থান। এটি শিপ্রা নদীতটে অবস্থিত। মহাকবি কালিদাস স্মৃতি বিজড়িত উজ্জয়িনীর প্রাচীন নাম অবন্তী। পুরাণ অনুযায়ী ত্রিপুরাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে মহাকাল শিব জয়লাভ করেন। এই ঘটনাকে স্মরণীয় রাখার জন্য অবন্তীর নাম হয় উজ্জয়িনী। উৎ+জয়নী=উজ্জয়িনী। নামটি জয়সূচক। সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল ছিল ৩৭৫ খ্রি: থেকে ৪১৫ খ্রি: । তিনি গুপ্তবংশের শক্তিশালী ও শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন। তাঁর ৪০ বছরের রাজত্বকালকে প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ বলা হয়। কালিদাস রচিত রঘুবংশ গ্রন্থ অনুযায়ী তিনি ২১টি রাজ্য জয় করেন এবং তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি ছিল শকদের পরাজিত করা। তিনি শকারি উপাধি গ্রহণ করেন। ইতিহাস ও আধুনিক খননকাজ থেকে জানা যায় সম্রাট অর্থাৎ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই দ্বিতীয় নতুন রাজধানী অবন্তীতে স্থাপন করেন এবং তাঁর জীবনের বিভিন্ন জয়ের সাফল্য স্মরণ রাখার জন্য অবন্তীর নাম পরিবর্তন করে জয়সূচক নাম 'উজ্জয়িনী' রাখতেই পারেন। উজ্জয়িনী আজ সংক্ষেপে উজ্জৈন নামে পরিচিত।

—**রাজকুমার জাজোদিয়া,**
কালিয়াগঞ্জ।

ইসকন কোনো জঙ্গি সংগঠন নয়

ইসকন জঙ্গি সংগঠন নয়। এঁরা প্রাণী হত্যা করে না, এজন্যে নিরামিষ খায়। ইসকন প্রথম ভারতের বাইরে সনাতন ধর্মের প্রচার শুরু করে। কলকাতার প্রভুপাদ আমেরিকায় ইসকন প্রতিষ্ঠা করেন। ইসকন হচ্ছে কৃষ্ণ সম্পর্কে সচেতনতা, এদের স্লোগান 'হরে কৃষ্ণ'। এটি কোনো দেশের নিষিদ্ধ নয়, ১৫৮টি দেশে এটি কৃষ্ণনাম জপ করে যাচ্ছে। ইসকন গেরুয়া পতাকা বহন করে। গেরুয়া হিন্দুদের পবিত্র প্রতীক। ইসকন দেশে দেশে সন্ত্রাসবাদ ছড়ায় না, ধর্মের নামে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে না, এঁরা ধর্মের নামে মানুষ হত্যা করে না।

যাঁরা বলছেন, ইসকন 'সন্ত্রাসী' সংগঠন, তাঁরা একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বলেছেন। এরা জীব হত্যা করে না, তাই এদের পক্ষে সন্ত্রাসী হওয়াটা কঠিন। বিশ্বের রাস্তায় রাস্তায় এঁরা 'হরে কৃষ্ণ' গেয়ে বেড়াচ্ছেন, 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে'। নিজেদের সন্ত্রাসী চেহারাটা ঢাকতেই কেউ কেউ ইসকনকে সন্ত্রাসী সংগঠন বলে থাকে। আইসিস, আল-কায়দা, বোকাহারাম বা এমনকী ৯/১১-র সন্ত্রসীদের সঙ্গে ইসকনের কোনো মিল নেই, ইসকন কাউকে জোর করে না, অন্য ধর্মের নিন্দা করে না।

ইসকন শুধু হরে কৃষ্ণ গেয়ে যাচ্ছে। এতেই অনেকের ভয়, কারণ 'সত্যকে' ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। বাংলাদেশে অনেক হিন্দু মন্দির ইসকনকে দান করা হচ্ছে। এতে ভূমিদস্যুরা বিরক্ত, কারণ একজন গরিব হিন্দুর সম্পত্তি জবরদখল যতটা সহজ, ইসকনের হাত থেকে দখল নেওয়া ততটা কঠিন। কারণ ইসকন সঙ্ঘবদ্ধ, তাঁদের ভক্ত আছে, টাকাপয়সা আছে, তাঁরা মামলা লড়তে পারেন। এতে ভূমিদস্যুরা সহজে হিন্দু সম্পত্তি দখলের অধিকার হারাচ্ছে! রাগটা তাই ইসকনের ওপর। ইসকন শান্তির কথা বলে, কাজ করে শান্তির পক্ষে। যারা অশান্তিতে বিশ্বাসী তারা ইসকনকে সহ্য করার কথা নয়।

ইসকন মানুষকে কৃষ্ণভক্তির পথে নিয়ে যাচ্ছে, এটিও ভয়, ইউরোপ-আমেরিকায় ইসকনের পতাকাতলে সাদা-কালোরা চলে আসছেন, এটাও ভয়। পাকিস্তানে বা ইরাকে বা মস্কোয় ইসকন রাস্তায় 'হরে কৃষ্ণ' গেয়ে বেড়াচ্ছে, এতে তাঁরা ভয় পাচ্ছেন, ভয় থেকেই এই প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের ঘটনা। দাবি করছে, ইসকন নিষিদ্ধ করতে হবে। এঁরা আহমদিয়াদের 'অমুসলমান' ঘোষণা করার দাবিও করে। তাহলে বুঝুন এরা কারা? ইসকন কারও ধর্মগ্রন্থ পোড়ায় না, যাঁরা ইসকন বন্ধের দাবি করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে বায়তুল মোকাররমে 'কোরান শরিফ' পোড়ানোর অভিযোগ আছে।

ইসকনের মহিলা রাস্তায় রাস্তায় 'হরে কৃষ্ণ' গাইছে ভক্তরা। যাঁরা ইসকন নিষিদ্ধ করতে চাইছেন, তাঁরা মহিলাদের ঘরের ভেতরে আটকে রাখতে চান। ইসকন গরিব মুসলমানদের একমাস ইফতার করান, ইসকনের ইফতার হারাম এ কথা তো শুনি না! মূলত জেহাদিরা ইসকনের বিরোধিতা করছে, এরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করছে, একুশ, পয়লা বৈশাখের বিরোধিতা করছে। এরা যখন ইসকনের বিরোধী, তাহলে ইসকন নিশ্চয় ভালো কাজ করছে, সঠিক পথে আছে। ঘটনা যাই হোক, ইসকন নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা এদের নেই।

—**শিতাংশু গুহ,**
নিউইয়র্ক।

শীতের খাবার এবং রকমারি রান্না

দিতি ভট্টাচার্য

বাঙ্গালির লোকজ ইতিহাস-ঐতিহ্যে পিঠেপুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে প্রাচীনকাল থেকেই। শীতকাল মানেই হিমেল হাওয়া আর কুয়াশার চাদর ভেদ করে পিঠেপুলির উৎসবে মেতে ওঠা, সংক্রান্তির পূজা। শহর হোক বা গ্রাম প্রতিটি বাড়িতেই তখন এক মোহনীয় গন্ধে তৈরি পিঠে-পায়েস আরও বেশি মধুময় হয়ে ওঠে।

পিঠে-পায়েস সাধারণত শীতকালের রসনাতৃপ্তির খাবার হিসেবে অত্যন্ত পরিচিত। আত্মীয়স্বজন ও পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনকে আরও দৃঢ় ও মজবুত করে তুলতে পিঠেপুলির উৎসব বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ঘরে ঘরে আবার নারকেল এগুলো থেকে মেলে বিভিন্ন ভিটামিন ও মিনারেলের সঙ্গে ফাইবার। শীতকালীন রকমারি শাকসবজি থেকে আমরা পাই প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও মিনারেল। এর ফলে দৈনন্দিন ডায়েটে আসে ব্যালেন্স। সব মিলিয়ে পিঠেপুলি, পায়েস, সঙ্গে বিভিন্ন রকম শাকসবজি, ফল মিলে শীতকাল জমজমাট।

অঘোষিত উৎসব। শীত আর পিঠে একে অপরের সঙ্গে পিঠোপিঠি জড়িত। শীত আসবে আর পিঠে খাওয়া হবে না, এমন অঘটন কখনো ঘটেছে বলে জানা যায় না। নতুন ধান ওঠে অঘ্রান মাসে। সে ধান থেকে বানানো হয় চাল। সে সুগন্ধি চালে তৈরি হয় পিঠে— এ হচ্ছে আবহমান বাঙ্গালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

'পিঠে' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'পিষ্টক' শব্দ থেকে। আবার পিষ্টক এসেছে 'পিষ্' ক্রিয়ামূলে তৈরি হওয়া করা হয়েছে। পিঠে খাবার প্রচলন বাঙ্গালি সমাজে অনেক প্রাচীন। বিশাল ভারতবর্ষে বসবাস করা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যেও পিঠে যে জনপ্রিয় খাবার সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় শব্দকোষে লিখেছেন, পিঠে হলো চালের গুঁড়ো, ডাল বাটা, গুড়, নারিকেল ইত্যাদির মিশ্রণে তৈরি মিষ্টান্নবিশেষ। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান খাদ্যশস্য ধান। ধান থেকে চাল এবং সেই চালের গুঁড়ো পিঠে তৈরির মূল উপাদান সঙ্গে নারকোল, দুধ এগুলো তো আছেই। এ সময় খেজুরের রস থেকে গুড়, পায়েস এবং নানারকম মিষ্টান্ন তৈরি হয়। খেজুরের রসের পিঠে পায়েস তৈরির ধুম শীতকালেই বেশি পড়ে। এগুলির মধ্যে জনপ্রিয় কিছু পিঠে হলো ভাপা পিঠে, চিতই পিঠে, দুধচিতই, দুধপুলি, ক্ষীরপুলি, সরা পিঠে, তিলপুলি, পাটিসাপটা, ফুলঝুড়ি, ধুপি পিঠে, নকশি পিঠে, মালাই পিঠে, মালপোয়া, পাকন পিঠে, ঝাল পিঠে ইত্যাদি। দেখতে গেলে প্রায় একশোর বেশি পিঠের প্রচলন রয়েছে।

এতো গেল পিঠের কথা। বাজার ভরে উঠেছে শীতের সবজি ও ফলে। বাজার থেকে বিদায় নিতে শুরু করেছে পটল-ঝিঙের মতো গ্রীষ্মকালীন সবজি। বাজারে গেলেই চোখে পড়বে ফুলকপি, বাঁধাকপি, বিট, গাজর, মটরশুঁটি, ক্যাপসিকাম, মুলো, বিনস, টম্যাটো, বেগুন, শিমের মতো শীতকালীন সবজির আধিক্য। আসলে শীতকাল মানেই তো টাটকা, তাজা রকমারি শাকসবজি। শুধু শাকসবজিই নয়, এই সময় আপেল, আঙুর আর কমলালেবুর মতো সুস্বাদু ফলেও বাজার ভরে যায়।

একদিকে যেমন পিঠের মূল উপাদান চালের গুঁড়ো, ডাল বাটা থেকে পাওয়া যায় কার্বোহাইড্রেট, ক্যালোরি, প্রোটিন, তেমন

পিঠেপুলি, পায়েস, স্বাস্থ্য গুণে ভরপুর, তবে আমরা বাইরে যে চকোলেট, কেক, পেস্ট্রি বা অন্যান্য প্যাকেটজাত খাবার খাই, তার মধ্যে থাকে ভালো পরিমাণ প্রিজারভেটিভ, সঙ্গে থাকে ক্যালোরি ও ফ্রি সুগার। ভিটামিন, মিনারেল বা ফাইবার থাকে না বললেই চলে কিছু প্রোডাক্ট বাদ দিলে। সেখানে সংক্রান্তির দিনে স্বাদ বদলের জন্য পিঠে খাওয়া সেভাবে কোনো সমস্যার সৃষ্টি করে না। অন্তত বাইরের প্যাকেটজাত খাবার বা ফাস্টফুডের থেকে অনেক ভালো। বাচ্চা থেকে বয়স্ক সকলেই পিঠে খেতে পারে। তবে কিছু বিশেষ অবস্থা যেমন ডায়াবেটিক বা ওজন কমাচ্ছেন যারা, তাঁদের বেশি পিঠে পায়েস খাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়।

আসলে পিঠে বানানো এবং তা খাওয়া, খাওয়ানো যে একপ্রকারের উৎসব, যাতে লেগে থাকে মাটির গন্ধ। সেটাকে বাদ দিলে মনটাই-বা ভালো থাকবে কী করে! আর বাঙ্গালির বারো মাসে তেরো পার্বণের থেকে পিঠেপুলিকে বাদ দেওয়ার মন বা মুখের জোর এখনো অবধি কোনো চিকিৎসক বা ডায়েটিশিয়ানের হয়েছে বলে জানা যায়নি।

(লেখিকা একজন পুষ্টিবিদ)

শর্করার আচমকা পতন ঘটলে

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

৬৩ বছর বয়সি বৃদ্ধা, দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিস রয়েছে। ইনসুলিন নিতে হয়। এমনই একদিন সন্ধ্যেবেলা ইনসুলিন নিয়ে হাঁটতে বেরিয়েছেন, তারপর হঠাৎ করেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। যদিও সেই সময় তাঁর ছেলে সঙ্গে ছিল, তাঁকে দ্রুত ঘরে নিয়ে আসেন। তারপর বোঝা যায় তার হঠাৎ করে সুগার ড্রপ করে যায়। আমরা সাধারণত হাই সুগার কতটা বিপজ্জনক হতে পারে সেটা নিয়ে নানা আলোচনা করি। সুগার থেকে হার্ট অ্যাটাক, কিডনি, নার্ভ, চোখের ক্ষতি ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা করি। কিন্তু খুব কম সময়ই কথায় উঠে আসে ব্লাড সুগার ফল করে যাওয়ার ব্যাপারটা। যাকে চিকিৎসার পরিভাষায় বলা হয় হাইপারগ্লাইসেমিয়া। হাইপারগ্লাইসেমিয়ার মতোই কিন্তু ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে হাইপোগ্লাইসেমিয়া।

ঠিক কী হয়?

সাধারণত আমাদের শরীরের যাবতীয় কাজের জন্য রক্তে সুগারের মাত্রা স্বাভাবিক থাকা খুব জরুরি। বিশেষত ব্রেন ফাংশন, ঠিক রাখতে, এনার্জির যথাযথ জোগান দিতে রক্তে সুগারের সঠিক মাত্রায় উপস্থিতি প্রয়োজন। মোটামুটি ৭০-৮০ মিলিগ্রাম প্রতি ডেসিলিটারে, এর থেকে কমে গেলেই সুগার ফল হয় বা রক্তে শর্করার মাত্রা প্রয়োজনের তুলনায় নেমে যায়। অনেকক্ষণ কেউ যদি না খেয়ে থাকেন তা হলে একটা মাত্রা পর্যন্ত লিভার থেকে গ্লাইকোজেন ভেঙে গ্লুকোজ তৈরি হয়। যা শরীরের এনার্জির উৎস। তবে একটা সময়ের পর এই প্রক্রিয়াও যদি কাজ না করে তখন রক্তে সুগারের মাত্রা ৭০-এর নীচে নেমে যায়। তখন নানা প্রকার অস্বস্তি শুরু হয়। এটাকেই বলা হয় সুগার ফল করা।

সাধারণত আমরা যাই খাই না কেন তা সুগারে পরিণত হয়ে এনার্জির জোগান দেয়। বিভিন্ন সময়ে খাওয়ার মাধ্যমে তাই এনার্জির তৈরি হয়। সুগার ফল করে এই শক্তির ঘাটতি হলেই সমস্যা শুরু হয়। যদি ১৫ সেকেন্ডের জন্যও এই শক্তির জোগান বন্ধ থাকে তাহলে তা থেকে শরীরের যে কোনও অঙ্গের পারমানেন্ট ড্যামেজ হতে পারে। এক্ষেত্রে এক ঝটকায় শরীরের উপর প্রভাব পড়ে। কখনও কখনও তা প্রাণঘাতীও হয়ে ওঠে। মস্তিষ্কে কোষগুলি কাজ করার ক্ষমতা হারায়, কার্ডিয়াক ডেথ হতে পারে।

কী করলে প্রতিহত হবে?

সুগার থাকলে সুগার নিয়ন্ত্রণ রাখার দিকে যেমন খেয়াল রাখতে হবে, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা অতিরিক্ত যেন কমে না যায় সেটাও খেয়াল রাখা। তাই ডায়াবেটিস ধরা পড়লে অতিরিক্ত সচেতন হয়ে গেলেও মুশকিল। খুব ব্যালান্স করে চলতে হবে। সুগার কমাতে চাইলে তা ধীরে ধীরে কমান। কিডনি ডিজিজ থাকলে তাঁদের সুগার ফল করে যাওয়ার প্রবণতা সর্বাধিক। তাই এঁদের বেশি সাবধান হওয়া প্রয়োজন। বয়স্ক রোগী বা ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তিদের সুগার ধরা পড়লে সেক্ষেত্রে তাঁদের দ্রুত সুগার কমানোর চেষ্টা করাই ভালো। ব্লাড সুগার থাকলে সেক্ষেত্রে তিন-চার ঘণ্টা অন্তর হালকা করে খেতে হবে। দীর্ঘক্ষণ খালিপেটে থাকা চলবে না। যাঁরা দুটি ইনসুলিন নেন তাঁদের বেশ বুঝে তবেই ইনসুলিন নিতে হবে। সাধারণত ব্রেকফাস্টের আগে একটি নিতে হয় ও রাতের খাবারের আগে আরেকটি নিতে হয়।

এক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে ব্রেক ফাস্টের আগে নেওয়া ইনসুলিনের সঙ্গে সকালের জলখাবার ও দুপুরের খাবার দুটোই সঠিক সময়ে খাওয়া দরকার। তবেই এই ইনসুলিন কাজ করতে পারে। অনেকেই যে ভুলটা করেন, দুপুরের খাবার খেতে অনেক দেরি করে ফেলেন, ১২টার জায়গায় ২-২.৩০ মিনিট বেজে যায় খেতে। তাহলে কিন্তু হঠাৎ করেই ব্লাড সুগারের মাত্রা অনেকটা কমে সমস্যা শুরু হয়। যাঁরা দীর্ঘদিন সুগারের রোগী এবং কড়া ডোজের ওষুধ খান তাঁদেরও সময়ে ধরে খেতে হবে। বাড়িতে গ্লুকোমিটার থাকলে সুগারের মাত্রা মেপে দেখা দরকার।

কোন কোন ক্ষেত্রে হয়?

- সাধারণত দেখা যায়, যাঁদের সুগার রয়েছে, ওষুধ বা ইনসুলিন নেন তাঁরা যদি এই ওষুধ খাওয়ার পর ঠিক সময়ে খাবার না খান তাহলে হঠাৎ করেই সুগার ফল করে যেতে পারে। কারণ ওষুধ খেলে তখন রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমে, তারপরই খাবার খেলে সেটা ব্যালান্স হয়ে যায়। কিন্তু খালিপেটে থাকলে বা প্রয়োজনের তুলনায় কম খেলে বা না খেয়ে কায়িক শ্রম করলে কিংবা খাবার খেলেন কিন্তু ভুলবশত প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ওষুধ খেয়ে নিলে হঠাৎ করেই মাত্রাতিরিক্ত সুগার ফল করে বিপত্তি ঘটতে পারে।
- আবার এমনও হয়, কারও হয়তো সুগার ধরা পড়েছে। ওষুধ চলছে কিন্তু হঠাৎ করেই খাওয়াদাওয়ায় মাত্রাতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেন। এটাও কিন্তু সুগার ফলের আরেকটি কারণ। খেতে হবে, কিন্তু কোনটা কতটা খাবেন সেটা চিকিৎসক ও ডায়েটিশিয়ানের পরামর্শ মতো খান।
- যাঁদের ক্রনিক কিডনি ডিজিজ রয়েছে, তা যে কোনো কারণে হতে পারে, দীর্ঘদিন হাইপ্রেশার থাকলে, ডায়াবেটিস থাকলে এমন হয়। কিডনিতেই কিন্তু ইনসুলিনের মেটাবলিজম হয়। এই কাজটা কোনো কারণে যদি ঠিক মতো হতে না পারে তাহলে কিন্তু ব্লাড সুগার ফল করতে পারে। সেটা শরীরের নিজস্ব ইনসুলিন বা বাইরে থেকে নেওয়া ইনসুলিন থেকেও হতে পারে?
- শিশু কিংবা অল্পবয়সিদের টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস হয়। এদের কিন্তু সুগার ফলের ঝুঁকি টাইপ টু ডায়াবেটিস যাদের রয়েছে তাদের থেকে বেশি। শিশু বা ছোটোদের ক্ষেত্রে ব্লাড সুগার ফল করা আরও বিপজ্জনক হয়।
- কিছু বিশেষ ওষুধ রয়েছে, যেগুলো খেলেও হঠাৎ করে আমাদের সুগার ফল করতে পারে।

সুগার ফলের প্রাথমিক লক্ষণ

● শরীরে অতিরিক্ত ক্লান্তি ● খিদে পাওয়া ● মাথা হালকা লাগা ● বুক ধড়ফড় করা ● গরম নেই অথচ ঘাম হওয়া ● হাত কাঁপা ● শেষ পর্যায়ে পৌঁছালে জ্ঞান হারান রোগী। ◻

পশ্চিমবঙ্গের বয়স্ক মানুষদের শীতকালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

ডাঃ সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শীতকাল পশ্চিমবঙ্গের বয়স্ক মানুষদের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসে, যেখানে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার তারতম্য বার্ধক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত স্বাস্থ্য সমস্যাকে আরও তীব্র করে তুলতে পারে। যেহেতু বয়স্কদের শরীর ঠাণ্ডার সঙ্গে মানিয়ে নিতে কম সক্ষম, এই সময়ে হাইপোথার্মিয়া, শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ, দীর্ঘস্থায়ী রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির ফলে শরীর-স্বাস্থ্যের অবনতি এবং মানসিক চাপের মতো সমস্যা বেড়ে যায়। এই সমস্ত ঝুঁকি মোকাবিলা করতে সমন্বিত জেরিয়াট্রিক মূল্যায়ন (Comprehensive Geriatric Assessment বা CGA) একটি কার্যকরী পদ্ধতি হিসেবে কাজ করতে পারে।

স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও মৌসুমি প্রভাব

শীতকালে বয়স্কদের মধ্যে শারীরিক তাপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কম থাকে, যার ফলে তাদের শরীরের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা বজায় রাখতে সমস্যা হয়। হাইপোথার্মিয়া (যা শরীরের তাপমাত্রা $<35°C$ হলে হয়), বিভ্রান্তি, হৃদযন্ত্রের ক্ষমতা হ্রাস এবং এমনকী মৃত্যুর কারণ হতে পারে। ঠাণ্ডা আবহাওয়া কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেমকে চাপে ফেলে, রক্তচাপ বাড়ায় এবং হৃদয়ের উপর অতিরিক্ত চাপ ফেলে। এর ফলে যাদের উচ্চ রক্তচাপ বা হৃদরোগ রয়েছে, তাদের মধ্যে সমস্যা বেড়ে যায়।

সমন্বিত জেরিয়াট্রিক মূল্যায়নের উপাদানসমূহ

CGA এমন একটি পদ্ধতি যা শারীরিক, মানসিক, পুষ্টিগত এবং শীতকালে বয়স্কদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা করতে সহায়তা করে। পশ্চিমবঙ্গের বয়স্কদের শীতকালীন চাহিদা পূরণের জন্য কয়েকটি পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকরী।

১. শারীরিক স্বাস্থ্য ও দীর্ঘস্থায়ী রোগের ব্যবস্থাপনা : রক্তচাপ, শ্বাসযন্ত্রের কার্যক্ষমতা, রক্তে গ্লুকোজ স্তর এবং শরীরের তাপমাত্রার নিয়মিত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। যাদের দীর্ঘস্থায়ী রোগ যেমন উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস এবং সিওপিডি রয়েছে, তাদের জন্য শীতকালে ওষুধের ডোজ পরিবর্তন বা কিছু বিশেষ ব্যবস্থাপনা করা উচিত।

২. পুষ্টি ও জলীয় শোষণ মূল্যায়ন : শীতকালে বয়স্কদের তৃষ্ণার অনুভূতি কম থাকে এবং ক্ষুধাও কমে যায়, যার ফলে শরীরে জল ও পুষ্টির অভাব হতে পারে। CGA-এর মাধ্যমে BMI, রক্তের হিমোগ্লোবিন এবং ভিটামিন ডি স্তরের মূল্যায়ন করা উচিত। ভিটামিন ডি এবং সি সমৃদ্ধ খাবার এবং সাপ্লিমেন্ট শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সহায়ক।

৩. কার্যক্ষমতা ও চলাফেরার মূল্যায়ন : শীতে কম চলাফেরা করার ফলে পেশী চলতে গিয়ে শক্ত হয়ে যাওয়া, গাঁটে ব্যথা এবং পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। CGA-এর মাধ্যমে গতি এবং ভারসাম্যের মূল্যায়ন করে ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা যায়। কিছু সহজ ইনডোর ব্যায়াম এবং ফিজিওথেরাপি— কার্যক্ষমতা বজায় রাখতে সহায়ক।

৪. মানসিক স্বাস্থ্য ও মানসিক মূল্যায়ন : শীতকালে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও যোগাযোগের অভাবে মানসিক অবসাদ ঘটতে পারে, মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে। CGA-এর মানসিক মূল্যায়নের অন্তর্গত জেরিয়াট্রিক ডিপ্রেশন স্কেল এবং মিনি-মেন্টাল স্টেট এক্সামিনেশন ব্যবহার করে মানসিক অবস্থা যাচাই করা উচিত।

৫. পরিবেশগত এবং সামাজিক সহায়তার মূল্যায়ন : পরিবার এবং যত্নকারীদের সাহায্য বয়স্কদের শীতকালে সহায়ক। ঘরের তাপমাত্রা সঠিকভাবে বজায় রাখা এবং ঘন ঘন পরিবারের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ সবরকম শীতকালীন ঝুঁকি হ্রাসে সহায়ক।

পরিবার ও সমাজের ভূমিকা

পরিবারের সদস্য ও সামাজিক স্বাস্থ্য কর্মীদের উচিত শীতকালে বয়স্কদের গরম পোশাক পরতে উৎসাহিত করা, ঠাণ্ডা থেকে তাদের দূরে রাখা এবং পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করা। এলাকাভিত্তিক স্বাস্থ্যের পরামর্শ প্রদানকারী কর্মসূচি এবং সিজনাল হেলথ চেক-আপ বয়স্কদের শীতকালীন চিকিৎসায় সাহায্য করতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের বয়স্কদের জন্য শীতকালে CGA ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা একটি কার্যকরী, সমন্বিত পদ্ধতি। এর মাধ্যমে ব্যক্তিগত শারীরিক, মানসিক, পুষ্টিগত ও পরিবেশগত চাহিদার মূল্যায়ন করে সঠিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা তৈরি করা সম্ভব, যা শুধুমাত্র ঝুঁকি হ্রাসেই সাহায্য করে না বরং মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়।

(লেখক একজন জেরিয়াট্রিশিয়ান)

শীতে স্বাস্থ্য সচেতনতা

ডাঃ সন্দীপন নন্দন ঘোষ

হেমন্ত এসে গিয়েছে মানেই শীতের আনাগোনা শুরু হয়েছে। কর্মব্যস্ত মানুষ গ্রীষ্মের দাবদাহের পরে একটু শান্তির আস্বাদ পায় শীতকাল এলে। কিন্তু এই ঋতুতেও মানুষের বিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা যায়। এই ধরনের সমস্যা থেকে কীভাবে আমরা সতর্ক থাকতে পারি সেই বিষয়ে এই প্রতিবেদন।

শীত আসার আগেই যে ঠাণ্ডা হাওয়া ভোরে বা সন্ধ্যায়, রাতে বয়, সেই হাওয়া থেকে অনেকেরই সর্দি, কাশি, গলাব্যথা, নাক বন্ধ হওয়া— এই ধরনের উপসর্গগুলি দেখা দেয়। যে সব বয়স্ক মানুষদের হাঁপানি বা অন্য কোনো শ্বাসকষ্টের সমস্যাযুক্ত রোগ আছে তাদের এই সময়ে অতিরিক্ত সতর্কতা বজায় রাখা উচিত। সারাবছরই তাদের ইনহেলার ও অন্যান্য ট্যাবলেট সেবন করে থাকতে হয়। তার মধ্যে নতুন করে সর্দি বা ঠাণ্ডা লাগলে এই মানুষদের উপসর্গগুলি বহুমাত্রায় বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে এবং কখনো কখনো তা ভয়ংকর রূপ ধারণ করতে পারে। তাই অতি অবশ্যই বয়স্ক মানুষেরা যারা প্রাতর্ভ্রমণ বা সান্ধ্যভ্রমণে বাইরে যান, তাদের শীতবস্ত্র, পাতলা চাদর বা মাফলার অবশ্যই সঙ্গে রাখা উচিত।

বয়স্ক মানুষদের সঙ্গে সঙ্গে শিশুদেরও বিভিন্ন রকমের অসুস্থতা দেখা যায় শীতকাল আসার আগে বা শীতকাল এলে। বেশিরভাগ শিশুদের স্বাভাবিকভাবেই ইমিউনিটি পাওয়ার একটু কম থাকে, তাই তাদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। শিশুকে ঠাণ্ডা জলে স্নান না করিয়ে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করানো, বাইরে নিয়ে বেরোলে শীতবস্ত্র পরিয়ে রাখা, কোল্ড ড্রিংকস বা আইসক্রিম না খেতে দেওয়া এবং যাদের ঠাণ্ডা লেগে যাওয়ার প্রবণতা আছে তাদের ক্ষেত্রে আগে থেকেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সেই অনুযায়ী চলা উচিত।

শীতে আরও একটি স্বাস্থ্য সমস্যা যা সাধারণত দেখা যায় তা হলো বিভিন্ন মানুষ যারা ব্যথায় কষ্ট পান, অস্টিয়োআর্থ্রাইটিস, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, অ্যানকাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস জাতীয় রোগে যারা আক্রান্ত, তাদের উপসর্গগুলি একটু বেশিমাত্রায় বৃদ্ধি পায় এই সময়। যথাযথ ডাক্তারি পরামর্শ আগে থেকেই নেওয়া প্রয়োজন সেক্ষেত্রে এবং হাঁটাচলা, সিঁড়িতে ওঠা, ভারী কাজ, ওঠাবসা খুব সাবধানে করা উচিত। আরও একটি অসুবিধা শীতকালে প্রায়শই দেখা যায়— তা হলো শুষ্ক ত্বকের সমস্যা। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মানুষদের ত্বক এইসময় অতিরিক্ত মাত্রায় শুষ্ক হয়ে যায়, ত্বকে সেই কারণে বিভিন্ন ধরনের র‍্যাশ বেরোতে পারে। সোরিয়াসিস বা অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস রোগে আক্রান্ত মানুষদের ত্বকেও শুষ্কতাজনিত বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ দেখা যায়। ডাক্তারবাবুদের পরামর্শ নিয়ে ভালো ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করলে এই ধরনের সমস্যাগুলি থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া যায়। সেরামাইড যুক্ত ময়েশ্চারাইজার হলে খুব ভালো। ত্বকের জন্য খুব রুক্ষ্ম সাবান ব্যবহার না করে নরম সাবান ব্যবহার করলে ভালো হয়।

শীতকালে প্রকৃতি অকাতরে ফুল, ফল ও সবজি উপহার দেয় আমাদের। এই সময় প্রতিনিয়ত তুলসীপাতা, বাসকপাতার রস, মধু সেবন করলে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। ভিটামিন সি যুক্ত বিভিন্ন ফল, সবজি যেমন পেয়ারা, কমলালেবু, ফুলকপি এইগুলি খাদ্যতালিকায় রাখলে তা স্বাস্থ্যের জন্য খুব ভালো। এছাড়া যথাযথ জলপান অবশ্যই করা উচিত এবং প্রতিদিন শরীরচর্চা করা প্রয়োজন, যতটুকুই হোক না কেন। আর এই সময় যে কোনো অসুবিধায় অবশ্যই ডাক্তারি পরামর্শ নিন। ◻

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

শীতে ত্বকের সমস্যা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে প্রচুর জল ও মরসুমি শাকসবজি খান

ডাঃ ইমরান ওয়ালি

শীত এসেই গেল। আর শীত আসা মানেই আমাদের শরীরের প্রতি একটু হলেও নজর দেওয়ার সময়টা বেশিই লাগে। বিশেষ করে রূপচর্চার ক্ষেত্রে। আমাদের দেশে, বিশেষ করে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দোসর হয় দূষণ। এই দুয়ে মিলে আমাদের রূপের আসল চাবিকাঠি, আমাদের ত্বককে ভীষণভাবে বিরক্ত করতে শুরু করে। প্রথম যে সমস্যাটা দেখা দেয়, সেটা হলো ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়। এই শুকিয়ে যাওয়া ত্বককে নিয়ে আমাদের চিন্তার শেষ থাকে না। কী করলে এই শুষ্কভাবটাকে দূর করা যায়, সেটা নিয়ে ভাবতে ভাবতেই হয়তো শীতকাল চলে যাবার সময় চলে আসে। শুধু শুষ্ক ত্বক নয়, এর সঙ্গে একটা অস্বস্তিকর চুলকানির প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় অনেকের ক্ষেত্রেই। এটাকে নিয়েও চিন্তার শেষ থাকে না।

শীতের সময় শুষ্ক ত্বক একটা সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু এর সঙ্গে যদি শরীরের মধ্যে থাকা অন্য কোনো রোগের সমস্যা বন্ধুত্ব পাতায়, তখনই সমস্যাটা আরও গভীর হয়ে ওঠে। আর এই বন্ধুত্বের মাত্রাটা বেড়ে যায় এই শীতের সময়। আরও একটি রোগের কথা বলতেই হয়, সেটি হলো সোরিয়াসিস। সোরিয়াসিসে আক্রান্তদের ক্ষেত্রে শীতকালে রোগটি খুব বেড়ে যায়, সঙ্গে বাড়ে চুলকানি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটু বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াটা জরুরি হয়ে পড়ে।

শীতকালের আরও একটি সমস্যা হলো খুসকি। এটিও অস্বস্তি তৈরি করে।

আমরা এই সবের সমস্যা থেকে কী করে নিজেদের রক্ষা করব?

প্রথমেই বলি, শীতকালে শরীরে জলের মাত্রা কমে যায়। ফলে শুষ্ক হয়ে পড়ে আমাদের শরীর। তার প্রভাব পড়ে আমাদের ত্বকেও। এই সময়ে প্রচুর পরিমাণে জল খেতে হবে। প্রতিদিনকার খাদ্য তালিকায় পরিবর্তন আনতে হবে। শীতকালে বাইরের খাবার যতটা এড়িয়ে চলা যায়, ততটাই ভালো। মরসুমি ফলের সঙ্গে এই সময়ে পাওয়া যায় বিভিন্ন রকমের শাকসবজি। যা কিনা আমাদের সারা বছরের খাবার থেকে পাওয়া যায় এমন প্রোটিন, ভিটামিনের ঘাটতি পূরণ করে। সেগুলিকে খাদ্য তালিকায় প্রথম সারিতে রাখতে হবে। শীতকালে হালকা ব্যায়াম করলে শরীরের পক্ষে খুব ভালো। আর এই সময়ে আমাদের একটা নতুন করে খাবার খাওয়ার সময় বানিয়ে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, মশলাদার খাবার একটু এড়িয়ে চলুন শীতকালে। দেখবেন সামান্য এই কয়টি বিষয় যদি একটু মেনে চলেন, আপনি ভালো থাকবেন।

শুষ্ক ত্বকের সমস্যায় কীভাবে নিজেকে বাঁচাবেন?

শীতকালে শুষ্ক ত্বক আমাদের ভয়ংকর অস্বস্তিতে ফেলে। এই ত্বকের আরও একটি সমস্যা হলো চুলকানি। তাই আমি, আমার পেশেন্টদের বলি, বাজারে অনেক রকমের ভালো ময়েশ্চারাইজার পাওয়া যায়। সেটি ব্যবহার করলে অস্বস্তি থেকে অনেকটাই মুক্তি পাওয়া যায়। আর ঘরোয়াভাবে নারকেল তেল মাখতে পারেন স্নানের আগে। এছাড়াও অলিভ ওয়েল ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। গোলাপ জলের সঙ্গে গ্লিসারিন মিশিয়ে স্নান করার আগে সারা শরীরে মাখিয়ে রাখলে খুব ভালো ফল পাওয়া যায়। সর্বোপরি নিজেকে পরিষ্কার রাখতে হবে সব দিক দিয়ে।

এই সময়ে একদিন ছাড়া একদিন শ্যাম্পু করবেন। কিন্তু যাদের খুশকি বা সোরিয়াসিসের বিষয়টা বেশি, তারা রোজ শ্যাম্পু করবেন।

এবার আসি পা ফাটার বিষয়ে। এই সময়ে অনেকের পায়ের গোড়ালি, হাতের তালু ফাটে। এক্ষেত্রে একেবারে একটি দেশীয় পদ্ধতি বলি। রাত্রে ঈষদুষ্ণ জলে ফাটা জায়গাগুলি ধুয়ে, মুছে, নারকেল তেল লাগালে খুব ভালো ফল পাওয়া যায়। যদি বাড়াবাড়ি পর্যায়ে যায় তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

(লেখক বিশিষ্ট চর্ম রোগ বিশেষজ্ঞ)

শীতে পরিযায়ী পাখির

তাপস অধিকারী

এরা পাখি জগতে এক বিস্ময়। প্রতিবছর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি নজরে পড়ে। আমাদের রাজ্যে সন্ধান মিলেছে আটশো সত্তরটি প্রজাতির। শুরু হয়ে গেছে ওদের ফিরে ফিরে আসা। আমাদের মানব-জীবনে এ এক পরম প্রাপ্তি। আমাদের হৃদয় সরোবর ও আকাশে পাখি-জল আর পাখি-হাওয়া। শীত পড়ুক না পড়ুক ওরা যে এসে গেছে। আরও আসছে। জলাশয় উন্মুখ। দিগন্ত প্রস্তুত। অদ্ভুত এক হিল্লোল। নীল নীলিমায় অজস্র উড়ান। কত সমুদ্র পাহাড় কত প্রতিকূলতা পেরিয়ে ওরা এসে গেছে। আমাদের অতিথি হয়ে। অনন্ত প্রসারিত। ওদের পাখার আলিম্পন মুগ্ধাবেশে পান করে আমরা সুখ-সাগরে। ওরা পরিযায়ী। হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তুর প্রাসাদ সংলগ্ন বাগানে রাজকুমার সিদ্ধার্থের সামনে যে শরাহত হাঁসটি এসে পড়েছিল, দেবদত্তের নিক্ষিপ্ত শরের আঘাতে যে পাখিটি আহত হয়েছিল সেও যে পরিযায়ী ছিল। পরিযায়ী বৃত্তান্ত নিয়ে বিস্তারিত আগে লিখেছি তাই বিশদে সেদিকে না গিয়ে বরং কয়েকটি পরিযায়ী পাখি সম্বন্ধে আপনাদের জানাবার প্রয়াস নিই। এখানে পরিসর অল্প তাই সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

'খঞ্জনার নাচন, শীতের কাঁপন'

এই পাখিটি সম্বন্ধে উপরিউক্ত প্রবাদটি আপনাদের সকলেরই জানা। বাংলা সাহিত্যে শ্যামা, দোয়েল, কোকিলের সঙ্গে সঙ্গে খঞ্জনাও

কবিদের অতি প্রিয় পাখি। যেন ঘর আলো করা লক্ষ্মী মেয়েটি। মহাকবি কালিদাসের রচনায়— 'কিং বা করিষ্যতি ভবদ্বকনারবিন্দে/ জানামি লো নয়ন খঞ্জনযুগ্মমেতৎ।।'— তোমার বদন অরবিন্দে দুটি খঞ্জন দেখে আমার ভাগ্যে কী হবে তা জানি না। এমন পঙ্‌ক্তি মেলে এই পাখি নিয়ে। নারীর সৌন্দর্য বর্ণনায় সংস্কৃত সাহিত্যে খঞ্জনা-উপমা

ইচ্ছে-ডানা

মেলে। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা নারীর চোখের সঙ্গে খঞ্জনার কোথাও মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। শীত পড়ার বহু আগে এরা আমাদের দেশে আসে সুদূর কাজাখস্তানের উপত্যকা থেকে। বলা ভালো, এরা এসে জানান দেয় শীত পড়তে আর বেশি দেরি নেই। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকেই এরা সমগ্র পূর্বভারতে ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের অতি আপন পাখি, সুখের পাখি, ভালোবাসার পাখি খঞ্জনা বিদেশের পাখি ভাবতে অবাক লাগে। এদের বিদেশি নাম— 'ওয়্যাগটেল'। পাঁচটি প্রজাতির খঞ্জনা আমাদের দেশে আসে।

ফরেস্ট ওয়্যাগটেল, হোয়াইট ওয়্যাগটেল, আমুর ওয়্যাগটেল, পাইড ওয়্যাগটেল এবং ব্ল্যাক হেডেড ওয়্যাগটেল। খঞ্জনার লেজ নাচানো, কর্মব্যস্ততা শুধুই চোখ জুড়োয় না, বিস্মিতও করে। অতটুকু শরীর। কোনো রকম ক্লান্তি নেই। একা একা থাকতেই পারে না। ঝাঁকে ঝাঁকে থাকে। শীতে পুরুষ পাখিটির উজ্জ্বলতা অভাবনীয়।

কাজল পাখির নাম দিয়েছেন বনফুল

আজ্ঞে হ্যাঁ, এই পাখিটির নাম ব্রাউন শ্রাইক। বাংলা নাম দিয়েছেন সাহিত্যিক বনফুল। বিজ্ঞান পরিভাষায় বলা হয়— ল্যানিয়াস ক্রিস্টাটাস। মাত্র সাত ইঞ্চি লম্বা। শরীরের ওপরের পালক বাদামি বা কালচে বাদামি। ঘাড়ের কাছ ও মাথার চাঁদি আরও গাঢ়। চোখের ঠিক উপর দিকে একটা কালো টান বা রেখা দেখা যায়। তার সঙ্গে অত্যন্ত সরু সাদা দাগ। অত্যন্ত লাজুক এই পাখিটি ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র ও অন্যান্য দেশেও আসে পরিযায়ী হয়ে। এদের আসল বাসস্থান সাইবেরিয়া, আমুর, কোরিয়া, পূর্ব চীন। শীতে পরিযায়ী হয়। কাজল পাখি আমাদের কলকাতা শহর ও আশেপাশেও দেখা যায়।

নীলশির (Mallard) : গলায় সাদা রিং থাকে। বুকের রং বিস্কুটের মতো। আকারে সাধারণ গৃহপালিত হাঁসের মতো। মাথা থেকে গলা পর্যন্ত সবুজ। ঠোঁট হলুদ। পেট ও পিঠ হালকা ছাই রঙা সঙ্গে বাদামির আভা। কোয়াক কোয়াক শব্দে ডাকে, এদের খাদ্য গেঁড়ি গুগলি। সাইবেরিয়া ও চীন থেকে এরা আসে। পুরুষ পাখিটির লেজের ওপর দিকের দুটি পালক উলটোদিকে মোড়ানো থাকে। যা অন্য কোনো পরিযায়ীর ক্ষেত্রে দেখা যায় না।

ভূতি হাঁস (White Eyed Pochard) : আকারে বেশ ছোটো। খাদ্য গেঁড়ি ছোটো মাছ, শামুক প্রভৃতি। মাথা থেকে বুক পর্যন্ত বাদামি।

পিঠের রং মেটে। লেজের দিক সাদা। চোখ দু'টি বেশ বড়ো। কিরর্ কিরর্ শব্দে ডাকে। সুন্দরবন, নদীয়া, বর্ধমানে ভালো সংখ্যায় দেখা মেলে। দেখা মেলে চিড়িয়াখানায়।

গিরিয়া হাঁস (Garganey Teal) : আকারে ছোটো। খাদ্য ভূতি হাঁসের মতো। এদের নীলডানা হাঁসও বলে। এদের শরীরের রং ও

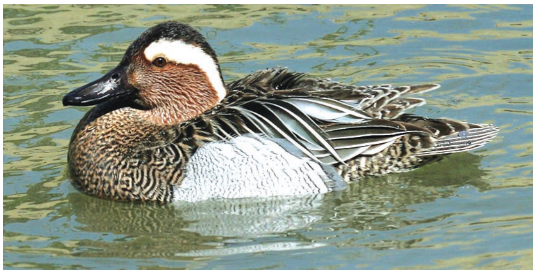

পালক খুবই দৃষ্টিনন্দন। ঝাঁকে ঝাঁকে ঘোরে। শব্দ করে না। এরা ইউরোপ থেকে আসে।

খুন্তে হাঁস (Shoveller) : এদের আকার গৃহপালিত হাঁসের মতো। এদের ঠোঁট চ্যাপ্টা খুন্তির মতো। মাথা সুবজ বুক সাদা পেট বাদামি। লেজের গোড়া কালো। প্রান্তভাগ সাদা। এদের ডাক— 'প্যাঁক প্যাঁক'। চিড়িয়াখানা, বানতলা, সাঁতরাগাছি বিভিন্ন জলাশয়ে দেখা মেলে।

নাকতা (Comb Duck) : এরা সিন্ধু নদের অববাহিকা ধরে আসে। জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের আগে এরা আসে না। চিড়িয়াখানা ছাড়েও সকলের পরে। ঠোঁটের ওপর একদলা মাংসপিণ্ড এদের চিনতে সাহায্য করে। আকারে পাতিহাঁসের চেয়ে বড়ো। গলা বুক ও পেটের রং সাদা। তার ওপর কালো ছিট থাকে। মাথার উপর খুব সূক্ষ্ম ছিট আছে। ঠোঁট গোলাকার। খাদ্য জলজ উদ্ভিদ ও কচিধান, এদের ডাক খসখসে।

বামনি হাঁস (Tufted Duck) : এদের মাথা-গলা-পিঠ উজ্জ্বল কালো। আকারে ছোটো। ঠোঁট নীলচে। চোখের ধার দিয়ে হলুদ রিং। মাথার পেছনে বড়ো মাপের টিকি যা আর কোনও হাঁসের দেখা যায় না। এরা ইউরোপ থেকে আসে। অনেকক্ষণ জলে ডুব দিয়ে থাকতে পারে তাই অন্য নাম 'ডুবুরু'। এদের প্রিয় খাদ্য শামুক, গেঁড়ি, গুগলি।

ফঃ ৪

রাঙামুড়ি (Common Pochard) : এদের মাথাটা পুরো লালচে। তাই রাঙা মুণ্ডু থেকে রাঙামুড়ি নামটা এসেছে হয়তো।

আকারে ছোটো। লেজের ডগা কালো। খাদ্য শামুক, মাছ, ব্যাং। ডাক শোনা যায় না। ইউরোপের জলা এলাকা থেকে এরা আসে।

সাইবেরিয়ান ক্রেন : উত্তর সাইবেরিয়া থেকে আমাদের দেশে আসে। মার্চ মাস অবধি থাকে। দুধ সাদা গায়ের রং। মাথার সামনের, পাশের আর মুখের রং লাল। ডানায় সাদা রঙের সঙ্গে অল্প সংখ্যক

কালো পালক আছে। জলা জায়গা পছন্দ করে। বিজ্ঞানসম্মত নাম গ্রাস লিউকোজেরানাস।

তুলসী বিগরি (Common Teal) : এদের লালচে বাদামি মাথায় চোখের উপর দিকে ঘাড় পর্যন্ত একটা উজ্জ্বল সবুজ পট্টি, চোখ ফেরানোই যায় না। ডানার ধারে, পেটের দিকে সাদা-সবুজ ও কালোর রেখা। পেট ও পিঠ ধূসর। সাইবেরিয়া ও ইউরোপ থেকে আসে। দ্রুতগতিতে উড়তে পারে, সাঁতারেও দক্ষ। এদের প্রিয় খাদ্য শস্যচারা ও বীজ। ধানখেত ও জলার ধারে বিচরণ করে। উত্তর গোলার্ধের পাখিরাই বেশি যাযাবর বা পরিযায়ী হয়। উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগের পরিমাণ বেশি হওয়ায় শীতের শুরুতেই তুষার জমতে শুরু করে। বরফে আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ঘরছাড়া হওয়া ছাড়া কোনও উপায় থাকে না। পাখির পরিমাণ নিয়ে গবেষণা আজও চলছে। এ এক দুরন্ত বিস্ময়।

জলমুরগি (Common Moorhen) : ইংরেজিতে Moor কথাটির অর্থ হলো— marsh, বা swamp, অর্থাৎ জলজ-উদ্ভিদ সমন্বিত জলাভূমিগুলিতে এদের দেখা পাওয়া যায়। এদের পালকগুলি কালো ও বাদামি বর্ণের। লেজের নিম্নভাগ সাদা বর্ণের। ঠোঁট লাল

এবং পায়ের রং হলুদ। জলজ পক্ষী হলেও এদের পা লিপ্তপদ নয়। ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়ার নানা স্থানে এদের পাওয়া যায়।

এছাড়াও ল্যাঞ্জাহাঁস (Pintail), কাদাখোঁচা (Snipe), চখাচখি (Ruddy shelduck, বা Brahminy duck), পিয়াং হাঁস (Gadwall)-এর মতো পরিযায়ী পাখিগুলি পাখিরালয় বা বিভিন্ন জলাভূমিতে পর্যটক ও পাখিপ্রেমীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে।

কয়েকটি জরুরি তথ্য জানাই এবার :

- এক ঘণ্টায় দু'শ কুড়ি মাইলের বেশি দূর যেতে পারে চেরা লেজ বাতাসী (Spine tailed Swift)।
- কবি বাল্মীকির মুখ থেকে যে আদি শ্লোকটি নিঃসৃত হয়েছিল তার মুখ্য প্রেরণা ছিল একটি চখাচখি পাখির বিরহ বেদনা। এরাও পরিযায়ী।
- আসা-যাওয়া মিলিয়ে তিরিশ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দেয় আর্কটিক টার্ন। বাঁচে পনেরো বছর। এটি বিশ্বরেকর্ড।
- একটানা বিরামহীন উড়ে রেকর্ড সৃষ্টিকারী ইস্টার্ন গোল্ডেন প্লোভার এক দুঃসাধ্য অভিযান সম্পন্ন করে।

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রকৃতিতে সবাই সবার উপরে নির্ভরশীল। যোগসূত্র তো একটা আছেই। আমরা কি সচেতনতা সর্বস্তরে বাড়াতে পারি না? আসুন, সমবেতভাবে চেষ্টা করি পরিযায়ী পাখিদের প্রতি আরও যত্নবান হতে। অবাঞ্ছিত ধুলো ধোঁয়ায় আরোপ করতে হবে বিধিনিষেধ, ক্ষতিকর গ্যাস, আবর্জনা যাতে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। কারখানা, গাড়ির ওপর আরও কঠোর নিয়ম প্রয়োগ জরুরি। চাষের জমিতে ক্ষতিকর সার ও কীটনাশকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে। তবেই আমরা উদাত্ত কণ্ঠে বলতে পারবো— 'নব নবীনের গাহিয়া গান, সজীব করিব মহাশ্মশান।' সুন্দর হয়ে উঠবে জল, মাটি, হাওয়া আকাশ, আমরাও হয়ে উঠবো সুন্দর। মুক্তপক্ষবিহঙ্গ পরিযায়ী হবে আত্মহারা আকাশনীলে। মেলে দেবে তার ইচ্ছে-ডানা। ■

বিশেষ প্রতিবেদন

খেজুরে হাঁড়ি বসছে গ্রামবাঙ্গলার দিকে দিকে

কল্যাণ গৌতম

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গে এবং সন্নিহিত এলাকায় এখন চারিদিকে গাছ ঝোড়ানোর সময়। তারপর 'মাটির ঘটি কাঠের গাই'। গাছ-হাঁড়ি যেন গাই-বাছুর। বরিশালে ভিটেমাটি হারানো পাড়াতুতো এক দাদুকে ছোটোবেলায় বলতে শুনতাম, 'ঝাকড় মাকড় মাথা/তার কোবা কোবা গা/ট্যাঙ্গে দড়ি গলা কাড়ি/গিল্লা গিল্লা খা।' তিনি রসের কথা বলছেন।

পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশের মাটিতে যত্রতত্র জন্মায় এই গাছ। এরই রস অতি উপাদেয় পানীয়, কেউ কেউ বলেন 'নীরা'। যে লৌকিক সমাজে খেজুর, তাল, নারকেল গাছ কাটা, ঝাড়া এবং সেই গাছের রস দিয়ে গুড় তৈরির জ্ঞান-ভাণ্ডার ছিল, তাদের বলা হতো 'সিউলি' বা 'গাছি'। এখন এই পেশায় লোকজন তেমন নেই, গাছও কাটা পড়েছে হাজার হাজার। পুকুরপাড়ে একঠেঙ্গো খেজুর গাছগুলো কোথায় গেল? আলের উপর অযত্নে বেড়ে ওঠা সব খেজুর গাছ? সেই চিরল চিরল পাতা, সেই সোনার মতো গা-ফল? গাছের আগায় হইলো সোনা/পাকলে আনে মজলে খা না!

বাড়ির কাছে খেজুর গাছে শীতকালে হাঁড়ি পড়তো। একদিন শীতের সকালে গেছি। সেদিন ডাক্তার উমাপদ চ্যাটার্জি শোনালেন রসের নান্দনিকতা। 'কাঁটা ভরা অঙ্গ হেরি সুদীর্ঘ আকার/প্রাণ আছে শিরে তার কেশের সম্ভার/জিহ্বার অগ্রেতে মধু বিন্দু বিন্দু ঝরে/জুড়ায় রসনা খানি পান করি নরে।' এই বলে তিনি এক গ্লাস টাটকা খেজুরের রস খেতে দিলেন। ওই রসের মেজাজ আজও ভুলিনি।

সিউলি নিমাইদা ছিলেন রসিক মানুষ। যাদের বাড়িতে খেজুর গাছ থাকতো, তিনি কার্তিক মাসে বাড়ি বাড়ি ঘুরতেন। আমাদের বাড়িওয়ালাকেও সুর করে বলতেন, 'ওরে বেটা কালাচাঁদ/দুধ খাবি তো বাছুর বাঁধ।' আমি বলতাম, ব্যাপারটা কী হলো! হেসে বলতেন, কাঠের গাই/বিকালে পানায়/সকালে দোয়াই। এরকম 'ছেদে মেদে' গাছ দুইতেন ভদ্রেশ্বর জোয়ারদার। তাঁর বয়স হয়ে গিয়েছিল, ছেলেরা সেই পেশায় যাননি।

গাছি ভাইয়ের সঙ্গে চুক্তি হতো মালিকের। রসের অর্ধেকটা তার, বাকিটা গৃহস্থের। গাছ কাটা, ঝোরা, হাঁড়ি বসানো, রস নামানো—পুরো কাজটাই গাছির। সিউলির বাড়িতে শীতকাল জুড়ে রস জ্বালের দো-আখা জ্বলতো। বড়ো কড়াইতে রস জ্বাল হতো সকাল সকাল। বিকেলে হতো চিটেগুড়। খেজুর গাছের শুকনো পাতা অবিরামভাবে আখায় ঠেলে দেন গাছি-বউ। ধীরে ধীরে টলটলে রসে রং ধরে, তখন কী মিষ্টি গন্ধ! আমি তন্ময় হয়ে দেখতাম। গুড়ে পাক ধরলে পর মাটিতে ছোটো গর্তে কাপড় ঢাকা দিয়ে নারকেল মালার হাতা দিয়ে গরম রস তুলে চটপট ঢালা হতো। শীতের ঠাণ্ডায় রস দ্রুত জমে জমে পাটালি হয়। তা কাপড় থেকে ছাড়িয়ে দ্রুত তুলে নিলে আবারও গর্তে ঘন রস পড়ে। সোনার মতো সে গুড়ের রং, আজ ওই কোয়ালিটি কোথায়! যত গ্রামের দিকে যাই, ততই দেখি। আজ সেসব কোথায় গেল? এখন পাঁচশো টাকা ফেললেও এক কিলো খাঁটি পাটালি পাওয়া যাবে না।

রাইমোহনবাবুর ছোট্ট ডোবায় পাড় বেঁধে ধনুকের মতো বেঁকে উঠে গেছে এক পুরুষ খেজুর। খেজুরের স্ত্রী আর পুরুষ গাছ আলাদা। মোচার গড়ন নিয়ে মাথা থেকে বের হয় পুষ্পবিন্যাস; গাছি ভাইয়ের ভাষায় 'বাদি'। রেণুর কাজ শেষ হয়ে গেলে তা ঝরে ঝরে পুকুরময় ছড়ায়। স্থির জলে একটি স্বচ্ছ ওড়না মনে হয়।

শীত আসার আগে সিউলি নিমাইদা আসেন। কোমরে তার মোটা দড়ি, পিঠে গোঁজা কাস্তে-কাটারি। কার্তিক-অঘ্রান মাসে পুরনো আর শুকনো ডাল কেটে প্রথমে সাফ করে দেন। গাছের সঙ্গে কৌণিক দূরত্বে দাঁড়িয়ে, নিজেকে দড়িতে বেঁধে শক্ত কাঁটা-পাতা ছাঁটেন। তারপর বেরিয়ে আসে ছাকনির মতো বাদামি জালতি। সব সরিয়ে পাতার গোঁড়া কেটে চাঁছ দিতে হয়।

কেমন ব্যাটিং ক্রিজের মতো সাদা চৌকো অংশ বেরিয়ে আসে তখন। সেখানে রসের ধারা বেরোনোর নলি লাগানো হয়। টপটপ করে রস এসে জমা হয় বাঁধা হাঁড়িতে। হাঁড়ি বাঁধার জন্য আলাদা গুঁজি থাকে। রস যাতে বাদুড়ে না চোষে, তাই একটি মেঠো ঢাকনি দেওয়া হয়। খুব ভোরে নিমাইদা হাজির হন। গাছে তড়তড় করে উঠে রসের হাঁড়ি পেড়ে আনেন। কোনো কোনো দিন ভাড়াটিয়াদের মধ্যে আমার ভাগ্যেও এক আধটু রস জোটে। কাঁসার বাটিতে ঠাণ্ডা রস চুমুক দিয়ে খাই। এক বুনো ভেজা গন্ধ। হাঁড়ি শোধন করার জন্য মাঝে মাঝে ভেতরে খড় পুড়িয়ে নেন নিমাইদা। সেই পোড়া গন্ধটুকুর অবশেষে মিলেমিশে এক অব্যক্ত রসসিক্ত মেজাজ রচনা হয়। আজও ভুলতে পারিনি।

মাদপুরে মাতৃশ্রাদ্ধে দুঃস্থদের শীতবস্ত্র বিতরণ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর প্রচারক নরেন্দ্রনাথ বেরার মাতৃশ্রাদ্ধের পরদিন গত ১৩ নভেম্বর নিয়মভঙ্গের অনুষ্ঠানে তাঁদের পরিবারের পক্ষ থেকে এলাকার ৮০ জন দুঃস্থ মানুষের হাতে ১টি করে কম্বল ও বিছানার চাদর তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে মা বীণাপাণি দেবীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন সঙ্ঘের কার্যকর্তা ও উপস্থিত গ্রামবাসী। সঙ্ঘকাজের ক্ষেত্রে সতত প্রেরণাদাত্রী রত্নগর্ভা মায়ের জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করেন সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সেবা প্রমুখ ধনঞ্জয় ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য সুনীলপদ গোস্বামী ও অদ্বৈতচরণ দত্ত, প্রান্ত প্রচারক প্রশান্ত ভট্ট, সহ প্রান্ত প্রচারক তরুণ মুখোপাধ্যায়-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক। উল্লেখ্য, ওই ৮০ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকেও সকলের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়িত করা হয়।

বহরমপুরে দীপাবলি সম্মেলন এবং তীর্থযাত্রী সংবর্ধনা

গত ১০ নভেম্বর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বহরমপুর জেলা কার্যালয়ের ভারতমাতা মন্দির সভাগৃহে সামাজিক সমরসতা অভিযানের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় দীপাবলি সম্মেলন এবং তীর্থযাত্রী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের। প্রদীপ প্রজ্বলন ও মঙ্গলাচরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এই দিন অনুষ্ঠানে মহিলা-পুরুষ-সহ ১৫১ সদস্য ও অন্যান্য সর্বস্তরের শুভানুধ্যায়ীরা উপস্থিত ছিলেন। ১৭ জন ডোম সমাজের ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ১০ জন তীর্থযাত্রীকে তিলক পরিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন

সামাজিক সমরসতার ক্ষেত্র প্রমুখ তথা মূল বক্তা গৌতম সরকার, মধ্যবঙ্গ সদ্ভাবনা প্রমুখ অমিত চৌধুরী, জেলা সভাপতি কৃষ্ণেন্দু সরকার। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন জেলা সমরসতা প্রমুখ সন্তোষ রজক এবং মঙ্গালাচরণ ও এককগীত করেন জেলা সৎসঙ্গ প্রমুখ বিবেকানন্দ মণ্ডল। সহভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন নগর সম্পাদক দেবাশিস দত্ত।

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের উদ্যোগে গোপাষ্টমী উদ্‌যাপন

গত ৯ নভেম্বর কার্তিক শুক্ল অষ্টমী তিথিতে কিষাণ সঙ্ঘের উদ্যোগে পালিত হলো সংগঠনের চারটি অবশ্য পালনীয় দিনের

অন্যতম গোপাষ্টমী অনুষ্ঠান। এই দিন রাজ্যের ২৩টি জেলায় গোমাতা পূজন হয়। গোমাতাকে স্নান করিয়ে, মালা পরিয়ে, শিঙে তেল ও মাথায় সিঁদুর পরানো হয় এবং পায়ে তিল, জল, ফুল দিয়ে পূজা ও প্রদীপ দিয়ে আরতি করা হয়। তারপরে গোমাতার পছন্দের খাবার দেওয়া হয়।

এই দিন অনুষ্ঠানে বক্তারা দেশি গোরুর উপযোগিতা, গোসংরক্ষণ ও সংবর্ধনের কথা তুলে ধরেন। এছাড়াও গো-আধারিত জৈব কৃষির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। গোহত্যা বন্ধ করতে আইন প্রণয়ন, জৈব কৃষিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা প্রদানে সরকারি হস্তক্ষেপের দাবিও জানানো হয়।

কার্তিক সংক্রান্তিতে শুরু এবং অঘ্রান সংক্রান্তিতে সমাপ্তি।

অঘ্রানের পয়লাতে শালিধান্যের ক্ষেত্র-উৎসব। আগের দিন নবান্নের দেবতা 'নবানে কার্তিক'-এর পূজা-আরাধনা হয়েছে। মাঠে মাঠে সোনালি ফসল ধান্যলক্ষ্মী হয়ে দিয়েছে ধরা। এখন 'আকবোল ধান' 'মুঠ' করে গোছ সমেত কেটে ঘরে আনার দিন, 'মুঠ আনা'। গৃহস্থ ভোরে স্নান সেরে নববস্ত্র পরিধান করে, কাস্তে হাতে, মাথায় গামছার উষ্ণীষ, কোমরে গামছা, খালি পায়ে ঈশাণ কোণ থেকে আড়াই আলুই ধান কাটবে, আড়াই প্যাঁচে পরম যত্নে বাঁধবে, 'মাগো, তোমার কৃপা যেন জন্ম জন্মান্তরে পাই। সন্তানকে দুধে-ভাতে রেখো মা। মাগো, অন্নলক্ষ্মী।' কার্তিক অমাবস্যায় বাঁধনা পরবে গোবন্দনা অনুষ্ঠানে আগেই গোমাতার আশীর্বাদ নিয়েছেন চাষি, সন্তানের দুধের জোগান হোক। গোয়ালঘরে বখনা আসুক। 'মুঠ-ধান' দেবতার আশিস। ঘরে লক্ষ্মীর আসন, উঠোনে-গোয়ালঘরে শস্যরূপা দেবী। কলাবউ সাজিয়ে দেবীকে তোলা হবে। আটনে-উঠোনে-মরাইয়ে মাঙ্গলিক পূজা হবে।

পয়লা অঘ্রান থেকে ধান কাটা শুরু, শুরু কৃষকের ব্যস্ততা। ধান কেবল আহার নয়, লোকায়তিক সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি। গোলায় ধান ভরলেই গলায় গান আসে! অর্থনীতির পুরোটাই ধানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। দিকে দিকে মুনিশের হাঁকডাক। ধান উঠে জমি খলি।

প্রাক্-শীত ও শীতকালীন পূজা-পালাপার্বণ

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

প্রাক্-শীত উৎসব

কার্তিক ব্রতের প্রধান অঙ্গ সংক্রান্তিতে কার্তিক প্রতিমার পূজা। সন্ধ্যাকাল থেকে শুরু হয়ে চার প্রহরে চারবার পূজা, সকালে বিসর্জন, যদিও পূর্ববঙ্গে প্রতিমা জলে দেওয়ার নিয়ম নেই। লোকসমাজে কার্তিক শস্য দেবতা। কার্তিক সংক্রান্তিতে গাওয়া হয় ফসল-সুরক্ষার গান। প্রতিমার পাশে রাখা হয় 'হালা', মাটির সরায় লাগানো নানান শস্য চারা। অনেক সময় উঠোনে গোল করে চারপাশে চারা তৈরি করে মাঝখানে প্রতিমা রাখা হয়। কার্তিক থেকে অঘ্রান সংক্রান্তি পর্যন্ত হৈমন্তিক ধান মাড়াই ও ঝাড়াই য়ের শুভপর্বে উদ্‌যাপিত হয় ইতুলক্ষ্মী ব্রত। ইতু পূজা সূর্যপূজা। সূর্য দেবতা কখন যে লৌকিক বিবর্তনে হয়ে উঠেছেন ধানকেন্দ্রিক শস্য দেবতা ইতুলক্ষ্মী, তার ইতিহাস অধরাই রয়ে গেছে। রবিবার দিনটিতে হয় ইতুর সাপ্তাহিক পূজা।

এরই মধ্যে উদ্‌যাপিত হয় নবান্ন। ইতু উদ্‌যাপনের শেষ পর্বে নিবেদিত চালের পিঠে, মুঠপিঠে আর পরমান্ন; কোথাও কোথাও এরই নাম 'সাধ'। মানভূম অঞ্চলে 'ইবতি'-র প্রতিষ্ঠা হয় মাটির হাঁড়ি চকখড়ি অনুরঞ্জিত করে, তাতে নানান গাছগাছালি। অনেক অঞ্চলে ইতুঘট পাতার সময় মাটির সরা লাগে; তার উপর ছড়ানো পাঁচ কড়াই (ছোলা, মটর, মাষ কলাই, মুগ ও যব)। পূর্ববঙ্গে হয় চুঙির ব্রত—

'মুঠ' উৎসব বা 'মুঠ লক্ষ্মী'র পূজা কোথাও পয়লা অঘ্রানও অনুষ্ঠিত হয়। স্নান করে, শাঁখ বাজিয়ে গঙ্গাজল, সিঁদুর নিয়ে ধানখেতে যাওয়া হয়। ঈশান কোণের আড়াই ঝাড় ধানগাছের ওপর গঙ্গাজল ছিটিয়ে, সিঁদুর দিয়ে ধান কেটে কলাবউয়ের মতো পাট করে, চেলি কাপড়ে মুড়ে শাঁখ বাজিয়ে আনা হয় বাড়িতে। তার খড় রাখা হয় লক্ষ্মীর ঝাঁপি, ধানের গোলা, চালের হাঁড়িতে।

নবান্নের আনুষ্ঠানিকতার সূত্রপাত কার্তিক পেরিয়ে অঘ্রানে। নবান্নে লঘু চাল থেকে প্রস্তুত হয় নানান পিঠেপুলি; থরে থরে সাজিয়ে দেওয়া দেবভোগ আর পিতৃভোগ। ধান্যলক্ষ্মী ঘরে এসেছে! অঙ্গন লেপে-পুছে আলপনার নান্দনিকতা; মরাইয়ের পাশে পিটুলির চিহ্ন-সংকেত, কৃষিজীবী মানুষের কামনার ভাষা নন্দনতত্ত্ব হয়ে দেখা দেয়। অন্নপূর্ণা কৃষকের বাস্তুতে অধিষ্ঠান করবেন। মা আর মেয়ে; দেবী দুর্গা আর দেবী লক্ষ্মীর যুগপৎ আশিস চাই। নবান্ন খাওয়া হবে; মুঠোর মধ্যে আজ ধান্য-কন্যা।

অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে খামারে লক্ষ্মী পেতে চিড়া-মুড়কি, মুড়ি, মুড়ির নাড়ু, কলাই ভাজা দিয়ে পূজা হয়। কার্তিক সংক্রান্তিতে যে ইতু পূজার সূত্রপাত, অঘ্রানের রবিবারগুলিতে আরাধনার পর সংক্রান্তিতে পরিসমাপ্তি। উমনো-ঝুমনোর ব্রতোপাখ্যান হয় শেষদিন। শেষ পূজায় মুঠো-পিঠে তৈরি হয় চালের গুঁড়ো, কলা, নারকেল, গুড় দুধে মেখে তার মণ্ড দিয়ে। ভেতরে ভরা একুশটি আতপ চাল, তা দুধে-খেজুর গুড়ে সেদ্ধ হবে। সংক্রান্তির পর ভোরবেলায় ইতু-সরা নদী বা জলাশয়ে বিসর্জন দেওয়া হবে।

সেঁজুতি ব্রতের সমাপ্তি অঘ্রান সংক্রান্তিতে; সান্ধ্যকালীন কুমারী ব্রত, আঙিনায় আলপনা ও প্রদীপ জ্বালিয়ে তার উদ্‌যাপন। আলপনায় কামনাত্মক বাহান্ন রকমের ছবি, মনস্কামনা পূরণের বাহান্ন ছড়া— তাতে গ্রামীণ নারীজীবনের সুখ-দুঃখের অকপট অভিব্যক্তি, বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি।

শীতের উৎসব

অঘ্রান সংক্রান্তিতে শুরু হয় 'তুষ-তুষলি' ব্রত। সারা পৌষের পর শেষ হয় সংক্রান্তিতে। ধানের হলদেটে-বাদামি খোসা হচ্ছে তুষ। নতুন তুষ নিয়ে কালো গাইয়ের গোবরে তৈরি হয় বর্তুল বা গুলি, তার মাথায় গোঁজা হয় দূর্বা। তুষ-তুষলিকে নারায়ণ ও লক্ষ্মী জ্ঞানে পূজা করে কুমারী মেয়ে। তুষলির মালসায় অগ্নিসংযোগ করে জলে ভাসিয়ে স্নান করে। এই ব্রতে সুখসমৃদ্ধি বাড়ে বলে বিশ্বাস। বাবা-ভাই-স্বামী-পুত্রের নিরাপদ জীবন ও প্রত্যাবর্তনের জন্য তুষ- তুষলির ব্রত। রাঢ়বঙ্গে অঘ্রান সংক্রন্তিতে শুরু হয় টুসু উৎসব। উৎসবের মূল কেন্দ্রবিন্দু গান। মকর সংক্রান্তিতে টুসু বিসর্জন। প্রাচীন বঙ্গের তুষালি ব্রতই হয়তো টুসুতে পরিবর্তিত হয়েছে।

গ্রামীণ জীবনে একদা ধানই ছিল ধন; আর মান্যতা গোধনে। ধান আর গোসম্পদের প্রতি গ্রাম-ভারতের চিরকালীন কামনা, গোলায় ভরার আকুতি, সন্তানকে দুধে ভাতে রাখার মিনতি। অন্তরের কথা কথাসাহিত্য হয়ে বের হয়, 'যার আছে গোলায় ধান/তার আছে কথার টান।' পৌষপার্বণ ধানকেন্দ্রিক অখণ্ড কৃষির পরিপূর্ণ রূপ; ধান্যলক্ষ্মীর উপাসনা; শালীধানের পৌষালি কৃত্য; হৈমন্তিক ধানের বাস্তবিক সত্য। ধান প্রকৃতির দান, ঈশ্বরের কৃপা, ভগবতীর বাৎসল্য ধারা; সম্পদ হয়ে গোলায় অধিষ্ঠান করে, উদর পরিতৃপ্ত করে। নবান্নের অন্ন স্বার্থপরের মতো গ্রামবাসী একলা নেয় না। আত্মীয়স্বজনকে দেয়, পাড়া-প্রতিবেশীকে বিলায়, গ্রামের সকলকে সেধে বিতরণ করে, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ সকলকে অর্পণ করে। আমার যে ক্ষুধা, তা বিশ্বেরও ক্ষুধা।

কৃষিজীবী মানুষ পৌষ সংক্রান্তির আগের পালন করে 'আউড়ি-বাউড়ি'; দেবী লক্ষ্মীর মর্ত্য-জীবনচক্র; ইকোসিস্টেমের জলচক্র আর সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার গ্রামীণ-সংবিৎ। সাগরে লক্ষ্মীর আবাসন, জল উবে ধোয়াডানা মেলে মেঘ হন দেবী। বর্ষায় মেঘমালা বর্ষণ, পাই ভৌমজল। তারই কাদামাটিতে লালিতপালিত হন ধান্যলক্ষ্মী। ওঠে সবুজ হিন্দোল, কাটি সোনালি ফসল; কৃষকের কাস্তেতে চয়িত হয়ে দেবী গোযানে চেপে আসেন কৃষকের গৃহে। 'আউনি' বা আগমন, কথা ভাষার 'আউড়ি'। দেবী সস্নেহে চেয়ে দেখেন চাষির ঘর-গেরোস্থালি, জঠরের জ্বালা, তাকে বলা হয় 'চাউনি', লোকভাষায় 'চাউড়ি'। তারপর গৃহবধূর পরম আহ্বানে চঞ্চলা লক্ষ্মী বাঁধা পড়েন— গোলাঘরে, বাক্স-তোরঙে, রান্নাঘরে, তৈজসপত্রে। গোবর দিয়ে মুঠকাটা খড় পাকিয়ে বন্ধনে দেবীকে অচলা করার নারী-আচার। এরই নাম 'বাউনি' বা বন্ধন, লোকভাষায় 'বাউরি'। তিন লোকসাংস্কৃতিক কৃত্য মিলিয়ে 'আউড়ি-বাউরি'। রাঢ়বঙ্গে তার নানান অধিরূপ।

'মকর সংক্রান্তি'-তে রবি মকর রাশিতে প্রবেশ করে। সূর্যোৎসবে দেশের নানা প্রান্তে পালিত হয় শস্যোৎসব। দিনটিতে শেষ হয় সূর্যের দক্ষিণায়ন। তারপর হবে সূর্যের উত্তরায়ণ। শীতের অবসানের সূচনা হবে, জড়তা-জড়িমার অবসান হবে। পৌষ-সংক্রান্তিতে পূজিতা হন পৌষলক্ষ্মী। সেখানে শাস্ত্রীয় ও লৌকিক আচার মিলেমিশে একাকার। বঙ্গে এইদিন 'পিঠেপরব' আর বসতভিটায় বাস্তুপূজার দিন। আগের দিনে তুলসীমণ্ডপে অনুষ্ঠিত হয় বাস্তুপূজা। 'ঝিকা'র ডাল বসিয়ে তার তলায় পূজা, মাটির হাঁড়িতে পাটশলমির আগুন, দুধ-চাল-বাতাসা ফুটিয়ে 'চরু' রেঁধে বাস্তুদেবতার ভোগ, নতুন চালের গুঁড়ি বা 'সবেদা', খেজুরগুড়, কোরা নারকেল, কলাই ডালের মণ্ড, মুগডাল সিদ্ধ, ক্ষীর ইত্যাদি দিয়ে প্রস্তুত হয় সুস্বাদু খাবার। পৌষপার্বণের দিন জমজমাট সমারোহ--- চন্দ্রপুলি, মোহনবাঁশি, ক্ষীরমুরালী, চন্দনপাটা; তৈরি হয় সেদ্ধ পিঠে, ভাজা পিঠে, সরুচাকলি; নানান বৈচিত্র্যের চিতোই পিঠে, গোকুল পিঠে, পাটিসাপটা, পাকান, ভাপা, কুলশি পিঠে, কাটা পিঠে, চাপড়ি, চুটকি, নকশি, হাঁড়ি পিঠে, ঝুড়ি পিঠে, পাতা পিঠে, তেজপাতা পিঠে, পোয়াপিঠে, ফুলঝুরি পিঠে, খেজুরপিঠে, চুষিপিঠে ইত্যাদি। বঙ্গের জনজাতি কৌমসমাজে তৈরি হয় মাংসপিঠে, সবজি পিঠে।

পৌষপার্বণের দিন বঙ্গের উঠোন-এগনা এক আশ্চর্য নান্দনিকতা। গোবরজলে নিকোনো উঠোন, তাতে আলপনার নানান সৌকর্য। ধানের ছড়া, লক্ষ্মীর পদচিহ্ন, দেবীর গয়না, চাষের উপকরণ— গোরু, লাঙল, জোয়াল, মই; পৌষ গাদা থেকে পূজার

শামিয়ানা, পূজাস্থল থেকে গৃহ-সিংহাসন— সর্বত্রই শুভ পদচিহ্ন। পিটুলিগোলা পায়ে পা ফেলে ফেলে দেবী ঘরে আসবেন, হবেন অচলা। কোথাও হবে 'বাহির লক্ষ্মীপূজা'। রাতে যখন দেবীর বাহন পেঁচা বা শেয়াল (দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের বিশ্বাস) ডেকে ওঠে তখন গৃহকর্ত্রী লক্ষ্মী তুলে ঘরে আনেন। বঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে পৌষপার্বণের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হয় 'পৌষ-আগলিয়ে'। মায়েরা পৌষ বন্দনা করে গেয়ে ওঠে, 'এসো পৌষ যেও না/জন্মে জন্মে ছেড়ো না।' কোথাও বানানো হয় 'পৌষবুড়ি'-র গোবরমূর্তি। সোনার পৌষকে ছাড়া যাবে না, বাঁধতে হবে, শস্য-সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে। তাই ঘরের আঙিনায় সোহাগি পৌষকে নানান ঝাঁপি নিয়ে আগলায় বঙ্গনারী। গ্রামে গ্রামে পৌষমাসে শুক্লপক্ষের বৃহস্পতিবার পৌষ -লক্ষ্মীর পূজা। এ প্রতিমাপূজা নয়, ফসলের নৈবেদ্যে, নতুন ধানের অলংকার নির্মাণ করে, নতুন চালের গুঁড়িতে দেবীর পদচিহ্ন এঁকে আরাধনা— শস্যদেবীর বোটানিক্যাল ফর্ম। ধনের দেবীর ধানের দেবীতে প্রকাশ মূর্ত হয়ে ওঠে, ছড়িয়ে পড়ে এক শস্যদেবীর ঐতিহ্য। পৌষপার্বণের অপরিহার্য আঙ্গিক তার অনুপম আলপনা।

শুধু যে পৌষলক্ষ্মীর পূজার স্থানেই আলপনা আঁকা হয়, তা নয়; আলপনা দেওয়া হয় সংরক্ষিত বীজধান রাখার মাটির কলসিতে, তার বেদীতে। আলপনা পৌষ সংক্রান্তির পর দিনও; এদিন কোনো কোনো জায়গায় 'যাত্রালক্ষ্মীর পূজা'। কোথাও 'বাউনি পূজা'। উঠোনের মাঝে কৃষিসরঞ্জাম রেখে চারপাশ জুড়ে আঁকা আলপনা। যে সরঞ্জাম দিয়ে কৃষিকাজে সাফল্য এসেছে, তারই ধন্যবাদাত্মক চিন্তন; সেগুলির কাদামাটি ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার দিন। ধান প্রথমে কৃষকের খামারে ওঠে, তারপর মাড়াই-ঝাড়াই করে গোলায় তোলা হয়। খামারও তাই মা লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান। কৃষক-রমণী তাই খামারেও আঁকেন আলপনা— লক্ষ্মীর পা, পদ্মফুল। যেদিন প্রথম ধান খামারে মাড়াই করা হবে, সেদিন খামার পূজা করার অনুষঙ্গেও মেইখুঁটি, মুঠ-ধানের মুঠি, ধামাকুলো, দাওনদড়ি, বলদের পাশে 'রেখা-আলপনা'। বাড়ির দুয়ার থেকে লক্ষ্মীর আসন পর্যন্ত আঁকা আলপনার নানান ঠাট। লক্ষ্মীগোলাকে কেন্দ্র করে উপর্যুপরি ক্রমে বৃত্তাকার আলপনা, তাতে মইয়ের নকশা। গোলার গায়েও আলপনা। পৌষপার্বণ উপলক্ষ্যে লক্ষ্মীব্রতের চালিতে প্যাঁচার ঠাট।

'পৌষপার্বণ এক শান্তি ও সমৃদ্ধির উৎসব

শীতকালে রাখা হয় 'লালুব্রত' তার অনেক নাম 'লাউল্যার বর্ত'। ব্রতের জন্য লাগে ছোটো-ছোটো কাঠের পিঁড়ি। তার উপর শীতের বিকেলে পুকুরপাড়ের নরম মাটি দিয়ে স্তূপ গড়া হয়, সেটাই লালু— অনেকটা শিব অথবা মন্দির, অথবা তাও নয়। বিকেলের রংবেরঙের ফুলে সন্ধ্যায় সাজানো হবে লালু, ফুলে ফুলে সর্বাঙ্গ ঢেকে যাবে, একটুও গা দেখা যাবে না। হলুদ অতসীর বোঁটা গায়ে গাঁথা হবে, গাঁদা-টগর-কলকে ফুলে সজ্জিত হবে লালুর দেহ ও পিঁড়ি। ভোরবেলা ঘুম-ভরা চোখে লালুর পিঁড়ি সঙ্গে করে কুয়াশা ঠেলে গাঁয়ের পথ তলা— হাতে সাজি— শিশিরে পা ভিজে যায়। শুকতারা তখন জ্বলজ্বল করে। পুকুরের ঘাটলায় জলের ধারে সিঁড়িতে লালু, জলের উপর ঘন কুয়াশা। কুহা ভাঙবে ব্রতচারিণী, তবেই সূর্য ঝিকমিক করে পুবের আকাশে উঠবে— এটাই হলো লালুব্রত। অন্য বালিকারাও একে একে আসবে। 'উঠো উঠো সূর্যিঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া,/না উঠিতে পারি মোরা শিশিরের লেইগা।' ধীরে ধীরে উঁচু গাছে কুহা উঠে, ভোর ছেড়ে বিশ্বে সকাল হয়। এভাবেই শীতের একমাস ধরে রোজ লালু গড়া, ফুল তোলা, লালু সাজানো, আর ভোরের আলো-আঁধারিতে ঘাটলার ধারে নিত্য আচার।

সাবেক পূর্ববঙ্গে মাঘমাসে পালিত হয় পাঁচবছর ব্যাপী সূর্যোপাসনা মূলক মাঘমণ্ডলের ব্রত। পঞ্চগুঁড়ির রঙিন আলপনা আঁকা হয় আর 'বারৈল' বা 'লাউল' নামে মৃত্তিকা-প্রতীক নির্মাণ হয়, ফুল-দূর্বা দিয়ে তার সাজসজ্জা ও পূজা হয়। আঙিনায় আঁকা হয় ব্রতমণ্ডল, গোলাকার সূর্য আর নীচে চন্দ্রকলা; মাঝে অয়নমণ্ডল। অয়নচিহ্নের সংখ্যা দ্বারা উপলব্ধ হয় ব্রত কত বছর চললো।

শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। 'সরস' শব্দের অর্থ জল। শুরুতে সরস্বতী ছিলেন জলের দেবী, নদীরূপে পূজিতা। শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরস্বতী নতীর প্রধান ভূমিকা ছিল। বিদ্যার দেবী ধারণা অপেক্ষা হয়তো প্রাচীন সরস্বতী নদীর এই বর্ণনা। উর্বর নদী উপত্যকায় কৃষির ফলন ছিল পর্যাপ্ত। তাই সরস্বতী নদীতীরে আর্য-ঋষিরা রূপদান করেছিলেন বৈদিক সংস্কৃতির। সেইসূত্রে জলের প্রত্যক্ষ দেবী কৃষি ও উর্বরতাকে ছাপিয়ে হয়ে গেলেন জ্ঞান ও বিদ্যার পরোক্ষ দেবী। সভ্যতার অভ্যুত্থান এবং তার ক্রমবিকাশে নদী সবসময় সহায়ক ও সঙ্গত ভূমিকা পালন করে এসেছে। তাই কল্পনা করা যেতেই পারে সরস্বতী নদীর দু'কূলে পলিমাটির উর্বর শস্যক্ষেত্র ছিল আর্য ঋষিদের 'শস্যাগার'। আবার 'সরস' শব্দের অপর অর্থ 'জ্যোতি'। ঋগ্বেদে সরস্বতীকে পাওয়া যায় অগ্নিরূপ, জ্যোতির্ময়ী এক দেবী রূপে। সরস্বতীর মধ্যে সূর্যকিরণের সপ্তবর্ণের ধারণা VIBGYOR এখানে পরিষ্কার। যেহেতু উদ্ভিদ দেহে বৃদ্ধি ও পরিস্ফুরণের অপরিহার্য শর্ত আলোক ও জল, সরস্বতী তাই সালোকসংশ্লেষ বা Photosynthesis প্রক্রিয়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সৌরশক্তির প্রত্যক্ষ প্রভাবে জলের আবর্তন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, জলের সরবরাহকারিণী দেবী সরস্বতীর সঙ্গে তাই কৃষি উৎপাদনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

'শ্রী' অর্থে লক্ষ্মী। মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে একসময় হয়তো লক্ষ্মীপূজাই হতো, এখনও অনেক পরিবারে দেবী সরস্বতীর সঙ্গে দেবী লক্ষ্মীকেও ভক্তি সহকারে ফুল নৈবেদ্য দেন। আর এই দিনটি থেকেই যেন শুরু হয় মুকুল-বিকাশের পর্ব, বসন্তের সৌকর্য, সুপ্তির অবসান, মনের মুক্তির মরশুম। দেবী সরস্বতী উপাসনায় লাগে পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব; ধান, যব, গম, মুগ, তিল দিয়ে এই পঞ্চশস্যের অর্ঘ্য রচিত হয় আর আম, অশোক, অশ্বত্থ, বট, যজ্ঞডুমুরের বিটপ দিয়ে সাজানো হয় পঞ্চপল্লব।

পলাশপ্রিয়া হলেন দেবী সরস্বতী। পলাশের রক্ত রং উর্বরতার প্রতীক, আর ঋতুমতী নারীর রজোদর্শনই প্রাণীসৃষ্টির প্রথম শর্ত। দেবী সরস্বতী তাই উর্বরতার অধিষ্ঠাত্রী রূপে পূজিতা; জলের দেবী, আলোর দেবী, উর্বরতার দেবী। ◻

স্বাধীনতার এক বহ্নিশিখা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

সৌমিত্র সেন

ব্রিটিশদের হাতে বন্দি হওয়ার পরিবর্তে মৃত্যুকেই বেছে নিয়েছিলেন যাঁরা, প্রীতিলতা ছিলেন তাঁদের একজন। ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ ছিলেন তাঁর আদর্শ নারী যা প্রীতিলতাকে শৈশব থেকেই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করে। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার আজকের দিনে এক বিস্মৃত বিপ্লবী নারী। ১৯১১ সালের ৫ মে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করা এই কিশোরী তাঁর জন্মস্থানে এতটা সুপরিচিত হতে পারেননি। তিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ চালিয়ে তাঁর স্বল্প জীবন দেশমাতৃকার চরণে সমর্পণ করেন।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার তখন এক প্রতিভাসম্পন্না ছাত্রী। তাঁর স্কুলজীবন শহরেই কাটে। তারপর ঢাকার ইডেন কলেজের শিক্ষার্থী থাকাকালীন, অন্যান্য মহিলা সংগঠনের সঙ্গে ধীরে ধীরে যোগাযোগ তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে প্রীতিলতার মনে ব্রিটিশবিরোধী ভাবনাগুলি প্রগাঢ়রূপ নিতে শুরু করে। এর মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং সুভাষচন্দ্র বসুর সহযোগী লীলা নাগের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ হন, যিনি দীপালি সঙ্ঘ নামে একটি বিপ্লবীগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে মহিলাদের লড়াইয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। পরবর্তী সময়ে প্রীতিলতা উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় আসেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেথুন কলেজে দর্শনশাস্ত্রের ছাত্রী হিসেবে ভর্তি হন। কলকাতা শহরেই প্রীতিলতার সঙ্গে 'মাস্টারদা' সূর্য সেনের পরিচয় হয়। মাস্টারদার অনুপ্রেরণায় প্রীতিলতা খুব শীঘ্রই তাঁর গোপন সংগঠনে যোগ দেন।

জালালাবাদে নিরীহ ভারতীয়দের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ১৯৩৩ সালে সূর্য সেন এবং একদল বিপ্লবী পাহাড়তলি ইউরোপীয় ক্লাবে' আক্রমণ করার জন্য একটি কৌশল পরিকল্পনা করেন। সেই ক্লাবের একটি সাইনবোর্ডে লেখা ছিল 'কুকুর ও ভারতীয়দের প্রবেশের অনুমতি নেই'।

সূর্য সেন এই মিশনের জন্য একজন মহিলা নেত্রীকে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। ঘটনার সাতদিন আগে ওই মিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কল্পনা দত্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই কারণে প্রীতিলতাকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রীতিলতা অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য এবং তাদের আক্রমণের পরিকল্পনা করবার জন্য কোতোয়ালির সমুদ্রতটে যান। ক্লাব আক্রমণের জন্য ৪০ জনের একটি দলের নেতৃত্বের জন্য নির্বাচিত হন প্রীতিলতা। তাঁরা ১৯৩২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ক্লাবে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেন। দলের প্রতি সদস্যকে পটাশিয়াম সায়ানাইড দেওয়া হয়, ধরা পড়লে যেন এটি মুখে দিয়ে আত্মবলিদান করতে পারে।

রাত পৌনে এগারোটার দিকে ক্লাবে পৌঁছে তাঁরা আক্রমণ শুরু করেন। ক্লাবটির ভিতরে তখন প্রায় জনা চল্লিশ লোক ছিল। বিপ্লবীরা হামলার জন্য নিজেদের তিনটি পৃথক দলে বিভক্ত করেন। তাঁরা আক্রমণ করার আগে ক্লাব ঘরটিকে চিহ্নিত করে ঘিরে ফেললেন।

প্রীতিলতা অবরোধ তৈরিতে সফল হন এবং তাঁর দল ক্লাবটিকে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেয়। ক্লাবে, কয়েকজন পুলিশ অফিসার তাদের রিভলবার থেকে পালটা গুলি চালাতে শুরু করে। একটি গুলিবিদ্ধ হয় প্রীতিলতার শরীরে। তিনি ব্রিটিশদের হাতে ধরা দিতে অস্বীকার করেন। তিনি যখন দেখলেন যে ব্রিটিশদের হাত থেকে বাঁচার কোনও উপায় নেই, তখন তিনি তার সহযোদ্ধাদের পালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং নিজে আত্মসমর্পণের পরিবর্তে সসম্মানে তাঁর নিজের জীবন পটাশিয়াম সায়ানাইড মুখে দিয়ে শেষ করেন।

পরের দিন পুলিশ প্রীতিলতার মৃতদেহ খুঁজে পেয়ে তাঁকে শনাক্ত করে। তার মৃতদেহ সন্ধান করতে গিয়ে পুলিশ কয়েকটি লিফলেট, রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ছবি, গুলি, হুইসেল এবং তাদের হামলার পরিকল্পনার খসড়া পেয়েছিল। ময়না তদন্তের সময় দেখা গেছে যে, বুলেটের আঘাত খুব গুরুতর নয় বরং সায়ানাইড বিষই ছিল তাঁর মৃত্যুর কারণ। তিনি যখন মাতৃভূমির জন্য প্রাণ দেন তখন তিনি ছিলেন মাত্র ২১ বছর বয়সের।

পূর্ববঙ্গে সেই ইউরোপিয়ান ক্লাবের সংঘর্ষস্থলটি জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ভারত ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে তাঁর জন্মদিন উদ্‌যাপন করা হয়। চট্টগ্রামে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার রোডও রয়েছে। ২০২২ সালে ঐতিহাসিক ইউরোপিয়ান ক্লাব সংলগ্ন বিদ্যালয়ের সামনে প্রীতিলতার একটি ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য তৈরি করা হয়েছে। □

সঙ্ঘের এক বনভোজনের চিত্র।

শীতের বনভোজন ব্যক্তি ও সমাজের বন্ধনকে দৃঢ় করে

পিন্টু স্যানাল

আলমোড়ার প্রাকৃতিক পরিবেশে কবিগুরু ছোটোবেলার চড়ুইভাতির কথা বর্ণনা করে লিখেছিলেন 'চড়িভাতি' কবিতাটি। শীতকালের হালকা সাদা মেঘের নীচে ছোট্ট বন্ধুরা মিলে বনভোজনের আয়োজনের যে চিত্র কবিগুরু এঁকেছেন তার সঙ্গে আমাদের সকলের কিশোরবেলার স্মৃতি মিলে যায়।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাস প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং তার সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মনোমুগ্ধকর আখ্যান। এই উপন্যাসটি মূলত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির বুননে গড়া, যেখানে গ্রামীণ প্রকৃতির মাঝে মানুষের জীবনবোধ এবং সম্পর্কের গভীরতা ফুটে ওঠে। প্রধান চরিত্র সত্যচরণ রায়চৌধুরীর দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাসটি বর্ণিত হয়েছে, যার মাধ্যমে পাঠক প্রকৃতির সান্নিধ্যে একজন শহুরে মানুষের আত্মিক পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেন। সত্যচরণের চরিত্র আমাদের শেখায় প্রকৃতির কাছাকাছি থাকলে মানুষের মনুষ্যত্ববোধ এবং আধ্যাত্মিক চেতনা কীভাবে বিকশিত হতে পারে।

ভারতীয় সভ্যতা প্রাচীনকাল থেকে প্রকৃতি ও আরণ্যক জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থ বিশেষত বেদ, উপনিষদ এবং বিভিন্ন শাস্ত্রে মানুষের জীবন ও প্রকৃতির মধ্যে অদৃশ্য কিন্তু দৃঢ় এক যোগের কথা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। এই যোগ কেবল পার্থিবজগতের মেলবন্ধন নয়, বরং আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক এক অন্তর্নিহিত সম্পর্ক, যা জীবনের অর্থ, উদ্দেশ্য ও সার্থকতার সন্ধান দেয়। নগরায়ন, প্রযুক্তির প্রভাব এবং কৃত্রিমতায় ঘেরা আজকের মানুষ প্রকৃতির সান্নিধ্য থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। তাই স্বস্তি পেতে কাজের ফাঁকে প্রকৃতির কোলে নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়া এখন নতুন 'প্রবণতা'। কিন্তু আধুনিক সমাজব্যবস্থার দৌড়ে ক্লান্ত মানুষের একটু জিরিয়ে নেবার মধ্যে প্রকৃতির তাৎপর্য খুঁজলে ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্যকেই উপেক্ষা করা হবে। মকর সংক্রান্তির আগে যখন পরিবেশের শীতলতার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে উৎসবের রেশ একটু মন্থর হয়, সেই সময়ে সামাজিক একত্রীকরণের আনন্দ পেতে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, ক্লাব বনভোজনের আয়োজন করে। সেখানে সাময়িক আনন্দটাই মুখ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু যে কারণে কংক্রিটের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে প্রকৃতির মধ্যে কিছু সময় কাটানো, তার দীর্ঘমেয়াদি সুফল ও গভীরতম অনুভূতির ছোঁয়া না পেলে 'সত্যচরণের উপলব্ধি'টা অধরাই থেকে

যায়। বনভোজনটা তখন শুধুমাত্র 'picnic' থেকে যায়। অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি অনুযায়ী, 'picnic' শব্দের অর্থ— a meal that you take with you to eat outdoors. —এতে শুধু মাত্র খাদ্য ভাগাভাগি এবং প্রকৃতির মাঝে একসঙ্গে কিছু সময় কাটানোর আনন্দ জড়িত থাকে।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে চারটি আশ্রম ছিল— ব্রহ্মচার্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের পর্যায়ে মানুষ গৃহত্যাগ করে বনবাস করতেন, প্রকৃতির মধ্যে থেকে আত্ম-অন্বেষণের চেষ্টা করতেন। বানপ্রস্থ আশ্রমে মানুষ পারিবারিক জীবন থেকে সরে এসে বনবাসের দিকে এগোতেন। এখানে এসে ব্যক্তিগত ইচ্ছা এবং কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে, এক নির্জন জীবনে প্রবেশ করতেন। সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশের আগে মানুষ এভাবে প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সংযোগ স্থাপন করতেন।

কিন্তু বর্তমান সমাজ তথা শাসন ব্যবস্থায় সাংসারিক কর্তব্যের মাঝে এই একটি দিনে প্রকৃতির মাঝে একত্রে খাওয়াদাওয়ার কী গুরুত্ব থাকতে পারে বা একদিনের ব্যক্তিগত উপলব্ধি সমাজ ও রাষ্ট্রকে কীভাবে পুষ্ট করতে পারে? আর তা যদি না করে তাহলে বিভিন্ন সংস্থার এই বনভোজনের উদ্দেশ্য কি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত আনন্দদানেই সীমাবদ্ধ থেকে আপন আপন স্বার্থের ক্ষুদ্র জগৎ থেকে বেরিয়ে নিজেদেরই স্বার্থকে পুষ্ট করা নয়? এই দুটি প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া যায় কিছু রাষ্ট্রবাদী সংস্থার বনভোজনের দিকে তাকালে। প্রচারের আলো তেমনভাবে না পড়লেও সনাতন ভারতবর্ষের ঐতিহ্যকে সঙ্গে করে এই ধরনের বনভোজন ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার ঊর্ধ্বে উঠে রাষ্ট্রীয় লক্ষ্যকেই উপলব্ধি করায়। তার সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনেরও সঠিক দিকনির্দেশ দেয়।

কামনা-বাসনার উদ্রেককারী ডিজের চিৎকারের বিপরীতে দেশাত্মবোধক ও ভক্তিমূলক সংগীত, সাত্ত্বিক খাবার এবং দিনের আলোয় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের পুনঃস্মরণ এই ধরনের বনভোজনের উদ্দেশ্য। শুধু একসঙ্গে খাওয়া নয়, যেন একদিনের 'গুরুকুল'— যেখানে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের যোগদান রাষ্ট্রগঠনে সবার অংশীদারিত্বের বার্তা দেয়। এই একদিনের অভিজ্ঞতা সামাজিক কর্তব্যের পাঠ দেয়। ব্যক্তিগত আনন্দের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের দীক্ষাদানের জন্যই এই ধরনের 'বনভোজন'। ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে, 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং' অর্থাৎ সমগ্র জগৎ ঈশ্বর দ্বারা পরিপূর্ণ। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই প্রকৃতিকে ঈশ্বরের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, যেখানে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায় পৃথিবীর প্রতিটি জীব ও জড় বস্তুর মধ্যে। বনভোজনের ভোজনপর্বের শুরুতেই ভাগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ২৪তম শ্লোক উচ্চারণ করা হয়—

ওঁ।। ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহর্বিব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা।।

অর্থাৎ সর্বত্রই ব্রহ্মনির্মিত এবং ব্রহ্মময়। যজ্ঞ বা উপাসনার প্রতিটি উপকরণই ব্রহ্ম, যিনি উপাসনা করছেন তিনিও ব্রহ্ম, যজ্ঞাগ্নিও ব্রহ্ম, এমনকী ব্রহ্মরূপ যজ্ঞকর্তার দ্বারা সেই আহুতি প্রদানও ব্রহ্ম এবং সেই ব্রহ্মকর্মে নিবিষ্টচিত্ত সাধকের প্রাপ্ত ফলও ব্রহ্ম হয়।

তারপরেই উচ্চারণ করা হয় 'ওঁ সহনাববতু, সহনৌ ভুনক্তু, সহবীর্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ।। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তিঃ।।' অর্থাৎ যেন আমরা একসঙ্গে, সহনশীলতার সঙ্গে এবং ঐক্যবদ্ধ থেকে অধ্যয়ন করতে পারি। আমাদের মধ্যে কোনো বিরোধ বা বিদ্বেষ না থাকে। একসঙ্গে আমাদের শক্তি বাড়ুক এবং অর্জন যেন ফলপ্রসূ হয়। মনে করিয়ে দেয় সমাজে থেকে মানুষকে সেই সমাজের সুরক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য কীভাবে কাজ করতে হবে। বনভোজনের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ একসঙ্গে এসে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণার্থে নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়। সর্বত্র শান্তি বিরাজ করুক।

ভোগবাদী ব্যবস্থার কুফলের শিকার নাগরিকের ভোগবিলাসের জন্য আরও একটি দিনের অনুষ্ঠান নয় বরং তার বিপরীতে স্বার্থত্যাগী হয়ে ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক বন্ধনকে মজবুত করার অনুষ্ঠান হলো বনভোজন। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সংস্কারদানের মাধ্যমে তার সঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্রের যোগের আত্মোপলব্ধি ঘটানো। তাই 'বনভোজন'-কে এই সংস্কারদানের একটা প্রয়োগশালা বলা যেতেই পারে।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ভারতে জন্মগ্রহণ করেও আধুনিক অন্তঃসারশূন্য জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে জীবনের গভীরতম উদ্দেশ্য ও তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাত্রা যা ভারতই বিশ্বের সামনে রেখেছে, সে সম্পর্কে অনভিজ্ঞ থাকেন। রাষ্ট্রের প্রতি সমর্পিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ডাকে এই ধরনের বনভোজনে এসে জীবনের এক নতুন দিক তাদের সামনে খুলে যায় আর একদিনের বনভোজনের স্মৃতি তাদের জীবনকে সার্থকতার দিকে নিয়ে যায়। বিভিন্ন বনভোজন প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার্য সামগ্রীর ব্যবস্থা আর শেষ নষ্ট করা প্রকৃতির কোলে প্রকৃতিবিরুদ্ধ তথা ভারতীয় সংস্কৃতিবিরুদ্ধ কাজ হয়ে যায়। রাষ্ট্রসচেতন সংস্থার দ্বারা আয়োজিত বনভোজনে এই ধরনের দৃশ্য বিরল।

আয়োজক সংস্থার নামের মধ্যেই আভাস পাওয়া যায় বনভোজন তার আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারবে কিনা। 'ভারত', 'রাষ্ট্র', 'সংস্কার', 'বিদ্যা' ইত্যাদি শব্দ আয়োজক সংস্থার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আর বনভোজনের ভারতীয়ত্ব সম্পর্কে একপ্রকার নিশ্চয়তা দেয়। বিদেশীয় নামে নিজেদের পরিচয় দেওয়া প্রতিষ্ঠান যেমন বনভোজনের সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির যোগ এবং বর্তমান সময়ে তার প্রাসঙ্গিকতার উপলব্ধি করতে পারে না, তেমনই তাৎক্ষণিক আনন্দ ব্যতীত জীবনকে সমৃদ্ধ করার মতো কোনো স্থায়ী অনুভূতির সৃষ্টিও করতে পারে না। তাই রাষ্ট্রভক্ত সংস্থার বনভোজন রাষ্ট্রবোধ পূর্ণ করে, উলটোদিকে অন্যদের তা মরিচিকার পিছনে অন্তহীন যাত্রার একটা অংশ হয়েই থেকে যায়। বনভোজনের একদিনের অনুষ্ঠান তাই আত্মাভিমান, বৈষয়িকতার বন্ধন শিথিল করে সত্যলাভ তথা ধর্মলাভের সহায়ক হতে পারে। রাষ্ট্রের প্রতি সমর্পিত সংস্থার বনভোজনে অংশগ্রহণ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবস্তার মাঝে সাত্ত্বিক অনুভূতি লাভের সন্ধান দেয়। □

ডাঃ জ্যোতির্ময় দত্ত

শীতকালে চোখকে সুস্থ রাখার একমাত্র উপায় দিনে তিনবার পরিষ্কার জল দিয়ে চোখ ধোয়া

শীতে আমরা চুল বা ত্বককে গুরুত্ব দিলেও, বাদ দিই চোখকে। কিন্তু আমার মতে সমান গুরুত্ব দিতে হবে চোখকেও। কেননা এই শীতে আমাদের চোখ কিন্তু বেশ কয়েকটাই সমস্যার মধ্যে পড়তে পারে। অন্যান্য ঋতুর তুলনায় চোখের সবচেয়ে সমস্যা দেখা দিতে পারে। কারণ এই সময়ে বাতাসে আর্দ্রতা কম থাকে। এতে চোখ শুকিয়ে যায়। আর চোখ শুকিয়ে যাওয়া কিন্তু নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। সেই সময়ে চোখের যত্ন আলাদা করে নিতে হবে। কয়েকটি সাধারণ সমস্যা, যেমন চোখ জ্বালা করা, একটা করকরে ভাব, চোখে কিছু একটা ঢুকে গেছে মনে হয়, চোখ লাল হয়, আর মাথা ব্যাথাও হয়। অনেক সময় মনে হয়, ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না বা ঝাপসা দেখছি।

এরকম সমস্যায় রোগী ভালো করে তাকাতেও পারে না। এই সমস্যার রোগীরা বেশি আলো সহ্য করতে পারে না। এই সমস্যার সমাধানে চোখ পরিষ্কার জল দিয়ে ভালো করে ধোবেন দু'তিন বার, খাবার জল দু' গ্লাস নেবেন, সেই জল দিয়ে চোখ ধোবেন। তিনবারের বেশি একেবারেই নয়। কেননা চোখের মধ্যে থাকা আরেক প্রকার জল বেশিবার ধোয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আরেকটি বিষয়, আমরা যেমন বাইরে থেকে এসে হাত ও পা ধুই, তেমনি বাইরে থেকে এসে চোখটাও ধুয়ে ফেলবেন পরিষ্কার জলে। মনে রাখবেন, সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে, সেই হাত দিয়ে চোখে জল দিতে হবে। এই শীতকাল কেন, সারা বছর নোংরা হাত দিয়ে চোখ ডলবেন না। সবাইকে মনে রাখতে হবে, আমাদের কাছে চোখ অতি মূল্যবান বস্তু। যা হারিয়ে গেলে, আর মূল্য দিয়ে ফেরত পাওয়া যায় না।

এই সময়ে প্রচুর পরিমাণে জল খেতে হবে, এক্ষেত্রে আমি বলি, চা, কফি, স্যুপ খেতে। শরীরটাকে রশে বশে রাখলে, তবেই শীতের সময়ে চোখ খুব ভালো থাকবে। যারা কন্ট্যাক্ট লেন্স পরেন, তাঁদের সাবধানতা নিতে হবে বেশি, সতর্ক থাকতে হবে বেশি। এই শীতের সময় আট ঘণ্টার বেশি না পরাই ভালো। ঘরে থাকলে খুলে রাখুন।

যারা সিগারেট খান, তাঁদের বলব, এই শীতকালে একটু কম খান বা একেবারেই খাবেন না। সিগারেট থেকে ড্রাই আই হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আর মনে রাখতে হবে, এই সময়ে ঠাণ্ডা লাগার একটা প্রবণতা থাকে। সেটা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য, যা যা করতে হয় করবেন। এই ঠাণ্ডা লাগা থেকেও চোখের সমস্যা দেখা দিতে পারে। শীতকালে কুয়াশা বা ধোঁয়াশা বাইরে দেখা যায়। এটা থেকেও চোখের সমস্যা দেখা দিতে পারে। আর এই সময়ে কনজাংটিভাইটিস হয়। এটা অবশ্য বায়ুদূষণ থেকেই বেশি হয়। ফলে সেদিকেও নজর দিতে হবে।

আমরা এই সমস্যার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই লুব্রিকেন্ট জাতীয় ওষুধ দিয়ে থাকি। তবে বলব, ওষুধের দোকানে গিয়ে কখনোই বলব না যে, আমাকে একটা চোখ লাল সারাবার ওষুধ দিন। কারণ, অজ্ঞানতা বা অসাবধানতাবশত ব্যবহৃত ওষুধে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে স্টেরয়েড জাতীয় কিছু আছে, যেটা চোখের মারাত্মক ক্ষতি করে দিয়েছে। চোখ নিয়ে অবহেলা করবেন না। যে কোনো সমস্যায় চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। তাঁর নির্দেশ মতো ওষুধ ব্যবহার করুন। দেখবেন আপনার সমস্যার সমাধান তিনি কত সহজে করে দিচ্ছেন।

(লেখক চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ, প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল)

শীতকালীন অর্থকরী ফুল

মিলন খামারিয়া

শীত এল মানেই বাগানও ভরে এল ফুলের রঙে, বৈচিত্র্যে। মিঠে ঝলমলে রোদে দাঁড়িয়ে থাকা যায় বলেই তো শীতের বাগানে ফুলের পানে চাইতে সাহস করি! শীতের এই ফুলগুলিই যে অনাময় জীবনের বার্তা হয়ে ফুলদানিতে সজ্জিত হয়ে আসে। বঙ্গের ফুলের হাটবাজার শীতের গোলাপে যেমন ভরে ওঠে, তেমনই মরশুমি ফুল গাঁদা, জারবেরা, গ্লাডিওলাসের অনবদ্য উপস্থিতি। এ রাজ্যের ফুল উৎপাদন অঞ্চলগুলিতে মাঠের পর মাঠ চাষ হচ্ছে অর্থকরী ফুল, তারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

জারবেরা : বর্ষার শেষে পলি হাউসে জারবেরা লাগানো হয়। টিস্যুকালচার পদ্ধতিতে তৈরি চারাই উত্তম। চারা রোপণ হবে ৪০×৩০ সেমি কিংবা দূরত্বে; এইভাবে পলি-হাউসে প্রতি হাজার বর্গমিটারে ছয় হাজার চারা লাগবে। পশ্চিমবঙ্গের জন্য ডাবল জাতের জারবেরা লাগানো উচিত; যেমন— রোজালিন, ভ্যানালিন, প্রাইমারো, স্যাদগ্রিয়া, স্যাজাও, কোবানা, স্যালভেডর, পিঙ্ক এলিগেন্স, রুবি রেড, গ্যালিয়েথ ইত্যাদি। পলিহাউসের মাটি শোধন করার জন্য ৪ শতাংশ ফরম্যালডিয়াইড মিশ্রণ প্রয়োগ করতে হবে। ফরম্যালডিহাইড ব্যবহারের পর পলিথিনে কয়েকদিন ঢেকে রাখার পর সেচের জলে মাটির রসায়ন বার করে দিতে হবে। জমি তৈরির জন্য লাগবে হেক্টর প্রতি ২.৪ টন নিম কেক, ১৬ কেজি ফসফরাস আর ২০ কেজি ম্যাগনেসিয়াম সালফেট। পরে চাপান সার হিসেবে ক্যালসিয়াম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট আর মিউরিয়েট অফ পটাশ (৫ : ৩) গাছ প্রতি ২.৫ গ্রাম। হাজার বর্গ মিটারের পলি হাউসে জারবেরা লাগিয়ে তিন বছরে নিট লাভ প্রায় তেরো লক্ষ টাকা আসা অসম্ভব নয়।

গ্ল্যাডিওলাস : আশ্বিন-কার্তিক মাস গ্যাডিওলাসের কন্দ লাগানোর সময়। বিঘা প্রতি কন্দ লাগবে পঁচিশ হাজার; কন্দ রোপণ করা হবে ২০×২০ সেন্টিমিটার দূরত্বে। গ্লাডিওলাসের উন্নত জাত হলো আমেরিকান বিউটি, মেলোডি, ভিক্সস গ্লোরী, ট্রপিক সী, অগ্নিরেখা, সুচিত্রা, মোহিনী, শোভা, মনীষা, স্বপ্না, অপ্সরা, পুনম, মুক্তা ইত্যাদি। গ্লাডিওলাসের জমি তৈরি করতে বিঘা প্রতি ১৫-২০ বস্তা গোবরসার আর ২৫-৩০ কেজি সরষের খোল প্রয়োগ করতে হবে শেষ চাষের সময় দিতে হবে ১০, ২০ এবং ৬ কেজি হারে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ। ম্ল্যাডিওলাস চাষ করে বিঘা প্রতি ৬৫ হাজার টাকা নিট লাভ হতে পারে।

গাঁদা : আশ্বিন ও কার্তিক মাস শীতকালীন গাঁদা লাগানোর সময়। বীজ ফেলে অথবা আগে সংরক্ষিত মা-গাছের ৭-৮ সেন্টিমিটার ডগা কেটে চারা তৈরি কর নিতে হবে। বীজের চারা একমাস বয়স হলে মূল জমিতে লাগানো হয়। চারা লাগাতে হবে ৪৫×৪৫ অথবা ৬০×৬০ সেন্টিমিটার দূরত্বে। আফ্রিকান গাঁদার উন্নত জাতগুলি হলো পুসা বাসন্তী, পুসা নারাঙ্গি, গোল্ড কয়েন, ইয়েলো কয়েন ইত্যাদি। এছাড়া হাইব্রিড ইনকা ও রক্তগাঁদার নানান জাত। গাঁদার জমি তৈরি করতে বিঘা প্রতি ১০-১২ বস্তা গোবর সার, ২০ কেজি খোল, ১০ কেজি করে ইউরিয়া, সিঙ্গল সুপার ফসফেট ও মিউরিয়েট পটাশ সার দিতে হবে। পরে চাপান সার হিসেবে এক বা দু'বার ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে।

(তথ্য সহায়তা ও চিত্রগ্রহণ : ড. কল্যাণ চক্রবর্তী)

ছবি : সুশোভন চট্টোপাধ্যায়

জনপ্রিয়তার পথে মহাভারতে উল্লেখিত খেলা খো খো

নিলয় সামন্ত

আগামী বছর প্রথম খো খো বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে জানুয়ারি মাসের ১৩-১৯ তারিখে নয়াদিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ইনডোর স্টেডিয়ামে। এই প্রতিযোগিতায় মোট ৩৫টি পুরুষ ও মহিলা দল অংশ নেবে। এশিয়া মহাদেশ থেকে অংশ নেবে ভারত, বাংলাদেশ, দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান, মালয়েশিয়া, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ভুটান ও ইন্দোনেশিয়া। ইউরোপ থেকে অংশ নেবে ইংল্যান্ড, লাটভিয়া, পোল্যান্ড, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও ওয়েলস। উত্তর আমেরিকা থেকে অংশ নেবে কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দক্ষিণ আমেরিকার একমাত্র দল পেরু। আফ্রিকা মহাদেশ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা, উগান্ডা, কেনিয়া, বুর্কিনা ফাসো, ঘানা, গিনি-বিসাউ, মালি, সেনেগাল, সিয়েরা লিওন ও টোগো। ওশেনিয়া থেকে থাকছে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড।

মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবপক্ষের চক্রব্যূহ রচনার কথা মাথায় রেখে স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক একটা খেলা আবিষ্কার করেন। যার নাম দেন তিনি খো খো। ১৯১৪ সালে তার রচিত নিয়মাবলী অনুযায়ী পুনের ডেকান জিমখানা ক্লাবে প্রথম আধুনিক খো খো খেলার সূচনা হয়। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে খো খো খেলার জন্ম ভারতবর্ষে। সেই খেলাই ১৯৩৬ সালের বার্লিন অলিম্পিকে কবাডি ও মালখম্বের সঙ্গে প্রদর্শনী খেলা হিসেবে দেখা গেছে। ১৯৮২ দিল্লি এশিয়ান গেমসে এই খেলা প্রদর্শিত হয়। ১৯৯৬ সালে কলকাতায় প্রথম এশীয় চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত স্যাফ গেমসে ২০১৬ সালে এটি প্রতিযোগিতা-মূলক খেলা হিসেবে নথিভুক্ত হয়।

প্রাচীন এই খো খো খেলার জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ ২০২২ সাল থেকে চালু হওয়া আল্টিমেট খো খো। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ফ্র্যাঞ্চাইজি দলগুলিকে নিয়ে চলে টুর্নামেন্ট। এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই ভারতের খো খো ফেডারেশন খো খো খেলার উন্নতিকল্পে নানান পদক্ষেপ নিয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে কিছুদিন আগে পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ায় হয়ে গেল পূর্বাঞ্চলের মেয়েদের জুনিয়র এবং সাব জুনিয়র খো খো প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় উভয় বিভাগে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও সিকিম মোট পাঁচটি রাজ্য অংশগ্রহণ করে। এই প্রতিযোগিতায় উভয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হওয়া ওড়িশার কোচ রঞ্জন বেহেরা জানান ওড়িশার খো খোতে জেলা হিসেবে বালেশ্বর অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে।

এই প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন বিহার রাজ্য খো খো সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নীরজ কুমার। তিনি বলেন খো খো ইন্ডিয়ার সভাপতি সুধাংশু মিত্তাল এবং সাধারণ সম্পাদক এমএস ত্যাগী খো খো-কে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। এর আগে তাঁরা এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ করিয়েছেন। এবার করাতে চলেছেন ওয়ার্ল্ড কাপ। তাঁদের লক্ষ্য এই খেলাকে এশিয়ান গেমসের অন্তর্ভুক্ত করা এবং তার পরবর্তীতে অলিম্পিক গেমসে অন্তর্ভুক্ত করা। তিনি আরও বলেন, এখন অনেক বিদ্যালয় জেলা খো খো সংস্থার তত্ত্বাবধানে খেলছে। বেশ কিছু ক্লাব খেলছে। ফলে নিয়মিত খেলোয়াড়রা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে।

আয়োজক পশ্চিমবঙ্গ ভালো ফল করেছে খো খো প্রতিযোগিতায়। তারাও জেলাস্তরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা থেকে খেলোয়াড় তুলে আনার চেষ্টা করছে। রাজ্য খো খো সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বলরাম হালদার জানান, আলটিমেট খো খো চালু হওয়ার পর থেকে খো খো খেলায় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোয় এই খেলার প্রতি আগ্রহ অনেকটাই বেড়েছে। পূর্বাঞ্চলের মেয়েদের জুনিয়র এবং সাব জুনিয়র বিভাগের খো খো খেলার আসর বসেছিল হলদিয়ার দুর্গাচকের পুনর্বাসন বিদ্যানিকেতনের মাঠে। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যানিকেতনের প্রধান শিক্ষক তপন কুমার জানা এবং প্রতিযোগিতার অন্যতম আয়োজক তথা প্রাক্তন খেলোয়াড় প্রিয়জিৎ সামন্ত। সিকিম রাজ্য দলের প্রশিক্ষক হিসেবে এসেছিলেন অমৃতা ও গিতু। তাদের কথায় সিকিমের নামচি, রুমটেক, লিমডেক প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষ এই খেলাকে গ্রহণ করেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পের সহায়তায় সিকিমে এই খেলার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে বলে। □

নবাঙ্কুর

গাছের ব্যথা

বিকাল চারটা। মোহনপুর শিশু মন্দির থেকে ছুটির ঘণ্টা বেজে উঠলো। কিছুক্ষণ পরেই দলে দলে ছাত্র-ছাত্রী বেরিয়ে আসছে। সাত্যকিও তার বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে এল। বাইরেই তার মা দাঁড়িয়েছিল। পিঠের ব্যাগটা মাকে দিয়ে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে চলল। পথের ধারে থাকা গাছের পাতা, ফুল ছিঁড়ে এদিক ওদিক ছড়াতে লাগল। মা যতই বারণ করে সে ততই বেশি করে ছিঁড়তে থাকে।

বাড়িতে ঢুকেই জামা, জুতা ছড়িয়ে ফেলেই বল নিয়ে খেলতে শুরু করে দেয়। অনেক বকাঝকার পর কোনোরকমে হাত পা ধুয়ে খেতে বসে। খেতে বসেই সে খেয়াল করে মায়ের মুখটা খুব গম্ভীর। আজকে তার মা তাকে আর আদরও করছে না, খাইয়েও দিচ্ছে না। শুধু খাবারটা দিয়েই চলে গেল বাগানের দিকটাতে।

খেয়ে উঠে সাত্যকি তার মাকে জিজ্ঞেস করল, 'মা, তুমি কি আমার উপর রেগে আছো?' মা কোনো কথা না বলে একটা ফুলগাছের দিকে তাকিয়ে বসে থাকল।

রাতেও তেমন কোনো কথা হলো না। রাতের খাওয়া সেরেই মা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল। সাত্যকিও শুয়ে পড়ল, কিন্তু ঘুম আসছে না যে। তার মা গাছ খুব ভালোবাসে। দিনের বেশিরভাগ সময়টাই গাছের যত্ন করতে থাকে। তাহলে কি গাছের পাতা ছিঁড়ে ফেলার জন্যই মা কষ্ট পেয়েছে? এইসবই সে ভেবে চলল।

হঠাৎ তার মনে হলো কারা যেন তার হাত-পা-চুল ধরে টানছে। একি সব গাছে তাকে আক্রমণ করেছে। তার মনে হলো চিৎকার করে মাকে ডাকি, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। একটা ফুলগাছ তার কাঁটা দিয়ে পায়ে খোঁচা দিল, আরেকটা গাছ কানটা টেনে বলল— কী, আমাদের ডালপালা ছিঁড়লে বুঝি কষ্ট হয় না? আমরা তোমাদের ফল, ফুল, ছায়া, শীতল বাতাস দিই আর তোমরা কিনা আমাদের কষ্ট দাও? সাত্যকি কাঁদতে শুরু করেছে, সে বলে উঠল, 'আমার ভুল হয়ে গেছে, আর কখনোও এমন করব না।' একটা গাছ তার মাথার পাতা দিয়ে আদর করে বলল, 'কথাটা মনে রোখো, ভালো ছেলেরা কখনোও এমন করে না।'

কীরে খোকা ওঠ, আর কত ঘুমাবি?

সাত্যকি চোখ খুলে দেখে যে তার মা মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। উঃ, তাহলে এটা স্বপ্ন ছিল! বিছানা থেকে উঠে চোখ-মুখ ধুয়েই ছুটল বাগানের দিকে। দেখে একদিকে একটা জলের বালতি আর মগ রয়েছে। ছুটে গিয়ে বালতিতে জল ভরে গাছের গোড়ায় দিতে শুরু করেছে। তার মা তখন জলের শব্দ পেয়ে ছুটে এসে ছেলের কাণ্ড দেখে তো অবাক।

সাত্যকি যখন গাছে জল দিচ্ছে, তখন যেন তার মনে হলো গাছগুলো খুব খুশি হয়েছে, আনন্দে হাসছে।

মা পাশে এসে দাঁড়াতেই মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'আর কখনও আমি গাছের পাতা ছিঁড়ব না।' মা তাকে আদর করে কাছে টেনে কপালে একটা চুমু দিয়ে বলে ওঠেন—

জন্ম হয়, বেড়ে ওঠে
তাদেরও লাগে দুঃখ ব্যথা,
বাসলে পরে ভালো তাদের
তারাও কয় মনের কথা।
ফল, ফুল আর মিষ্টি ছায়া
না চাইতেও দেয় যে তারা,
তাদের জন্যই বেঁচে আছি
গাছের মতন বন্ধু কারা?

—সোমকান্তি

জাতীয় উদ্যান

কাজিরাঙ্গা

অসম রাজ্যের গোলাঘাট, সোনিতপুর, বিশ্বনাথ ও নওগাঁ জেলার বিস্তৃর্ণ এলাকায় অবস্থিত কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যান। এই উদ্যানের পাঁচটি রেঞ্জ রয়েছে। এটি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মর্যাদা পেয়েছে। কাজিরাঙ্গার প্রধান সম্পদ হলো বিশাল একশিং বিশিষ্ট গণ্ডার। বর্তমানে এই উদ্যানে গণ্ডারের সংখ্যা ২৬৩১টি। রয়েছে পার্কটি হাতি, বন্য জলমহিষ, জলাহরিণ, সম্বর হরিণ, হগ হরিণ, বাঘ, চিতাবাঘ। এছাড়া রয়েছে ছোটো বড়ো বহু জন্তু এবং বহু প্রজাতির পাখি ও সরীসৃপ।।

এসো সংস্কৃত শিখি-৪৪

एकवचनम् -वहुवचनम् (पुंलिङ्गे)

बालकः-बालकाः (একজন বালক। অনেকগুলি বালক।)

छात्रः-छात्राः(একজন ছাত্র। অনেকগুলি ছাত্র।)

अभ्यास कुर्मः--

पुरुषः-पुरुषाः। लेखकः-लेखकाः। पण्डितः-पण्डिताः। सेवकः-सेवकाः। भक्तः-भक्ताः। शुनकः-शुनकाः। विडालाः-विडालाः। दीपः-दीपाः। सुधाखण्डः- सुधाखण्डाः। कार्यालयः- कार्यालयाः। चषकः-चषकाः। करदीपः-करदीपाः। प्रकोष्ठः-प्रकोष्ठाः। दन्तकुर्चः-दन्तकुर्चाः।

प्रयोग कुर्मः

देशः ग्रामः, सन्तानः, वृक्षः, शृगालः, दुष्टः, राक्षसः, ब्राह्मणः, वैद्यः, तण्डुलः,आसन्दः।

ভালো কথা

কালীপূজা

প্রতি বছরের মতো এবারও স্বস্তিকা পত্রিকার অফিসে কালীপূজা হলো। এবার কিন্তু প্রতিমা কুমোরটুলি থেকে আনা হয়নি। আমাদের শাখার বিদ্যুৎদা (বিদ্যুৎ প্রধান) স্বস্তিকা অফিসেই প্রতিমা বানিয়েছেন। এবার স্বস্তিকার দাদারা একটি বৈঠকের জন্য গ্বালিয়র গেছিলেন। তাই স্বস্তিকার সম্রাটদা, সঞ্জয়দা, চিত্তদা, শুভদার সঙ্গে আমাদের বীরেশ্বর শাখার সবাই ব্যবস্থাপনায় ছিলাম। পূজার দিন সকাল থেকেই আমরা নানান কাজে হাত লাগিয়েছিলাম। সন্ধ্যায় কুমারীপূজা দিয়ে পূজা শুরু হলো। সাড়ে সাতটায় প্রসাদ বিতরণ শুরু হলো। অনেক গণ্যমান্য লোক এসেছিলেন। পরদিন বিকেলে ধুমধাম সহকারে দল বেঁধে গঙ্গায় প্রতিমা নিরঞ্জন দিয়ে এলাম। আমার মনে হলো এবার যেন আনন্দ একটু বেশি হলো।

নীল সুর, নবম শ্রেণী, বি ডি লেন, কল-৭।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	সঠিক ভাবে সাজাতে হবে
(১) থ অ ন্ধু না	(১) তি জা র অ গ ণ
(২) ভি ন্দ অ ন	(২) য় অ প জ্ঞা রি চ ত

২৮ অক্টোবর সংখ্যার উত্তর

(১) প্রতিযোগিতা (২) করকমল

২৮ অক্টোবর সংখ্যার উত্তর

(১) কুকুরকুণ্ডলী (২) কুচকাওয়াজ

উত্তরদাতার নাম

(১) বর্ণিনী সরকার, বি এস রোড, মালদা। (২) শিবম রায়, রায়নগর, ডায়মণ্ডহারবার, দ: ২৪ প:
(৩) প্রীতিজা মাঝি, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর (৪) সুপর্ণা নন্দী, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER ®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com, www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

PMS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

ডোমজুড় বিসনস প্লাজা (পোস্ট অফিসের নিকেটে), ৩য় তল, ডোমজুড়, হাওড়া।

মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

প্রচণ্ড শীতেও সীমান্তরক্ষায় অতন্দ্রপ্রহরী ভারতীয় সেনা

কর্নেল কুণাল ভট্টাচার্য (অবসরপ্রাপ্ত)

সীমিত সড়ক পরিকাঠামো, পানীয় জলের অভাব, আঘাতের প্রবল সম্ভাবনা এবং প্রচণ্ড ঠাণ্ডাজনিত অসুস্থতা, চিকিৎসা পরিষেবার অভাব, তুষারপাতের মতো অসংখ্য কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে বিপুল সংখ্যক সৈন্য এমন এলাকায় দেশের সীমানা প্রহরায় রয়েছে, যেখানে ১৯৬২ সাল থেকে কেউ বাস করেনি। এই শীতকালে জম্মু, কাশ্মীর এবং পূর্ব লাদাখ ও অরুণাচল প্রদেশে ভারতীয় সেনাবহিনী যে বিশাল প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়ে থাকে, এই নিবন্ধে সেই বিষয়েই আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

২০২০ সালের জুনে গালওয়ান উপত্যকায় ভারতীয় ও চীনা সেনার মধ্যে হিংসাত্মক সংঘর্ষের পর থেকে, ৩,৪৮৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এলএসি বরাবর উত্তেজনা বেড়েছে, যার ফলে উভয় পক্ষের সমরসজ্জা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সমস্যা নিরসনের জন্য চলমান কূটনৈতিক ও সামরিক আলোচনা সত্ত্বেও, দুই পারমাণবিক শক্তিধর প্রতিবেশীর মধ্যে স্থায়ী 'বিশ্বাসের ঘাটতি' দেখা দিয়েছে। উত্তপ্ত পরিস্থিতি সম্প্রতি কিছুটা শীতল হলেও কৌশলগত অগ্রগতির অবস্থানসমূহ ধরে রাখতে ক্রমাগত সৈন্য মোতায়েনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। লাদাখের উচ্চভূমিতে তাপমাত্রা ইতিমধ্যে মাইনাস ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে নামতে শুরু করেছে এবং সেনাকর্তৃপক্ষ ভারতীয় সৈন্যদের জন্য তাঁবু, ফাইবারগ্লাস নির্মিত ঘর এবং বিশেষ শীত-পোশাক কেনা শুরু করেছে। শীতকালে তুষারাবৃত এলাকায় সৈন্যদের যে সমস্যাগুলির সম্মুখীন হতে হয় তা হলো :

চরম ঠাণ্ডা : তাপমাত্রার তীব্র হ্রাসে বেঁচে থাকা। তাপমাত্রার হ্রাসপ্রাপ্তি দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য মারাত্মক সংকট তৈরি করে।

সুউচ্চ ট্রান্স-হিমালয়ান রেঞ্জ : সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১১,০০০ ফুট উপরে লাদাখের অবস্থান। এরকম উচ্চতা মারাত্মক অসুস্থতার (High Altitude sickness) কারণ হতে পারে এবং অক্সিজেনের মাত্রা হ্রাসে মানুষের মৃত্যুও ঘটতে পারে।

দূরবর্তী অবস্থান : অনেক অঞ্চলের দুর্গমতা— সরবরাহ ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তোলে, সহায়তা প্রচেষ্টাকে জটিল করে তোলে।

কঠোর আবহাওয়া : সৈন্যরা তুষারঝড়, তুষারপাত এবং সীমিত দৃশ্যমানতার (Poor visibility) মতো ভয়ংকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়, যার ফলে সৈন্য চলাচল ও যুদ্ধপ্রস্তুতি নানাভাবে ব্যাহত হয়।

দৈহিক চ্যালেঞ্জ : রুক্ষ ভূখণ্ড ও সুউচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে কঠিন প্রাকৃতিক পরিবেশ সহ্য করার জন্য সৈন্যদের সর্বোচ্চস্তরে শারীরিক অবস্থা এবং মানসিক দৃঢ়তা বজায় রাখতে হয়। তাছাড়া তারা অন্যান্য যে চ্যালেঞ্জগুলির সম্মুখীন হয় তার মধ্যে রয়েছে :

সীমিত সুযোগসুবিধা : যেকোনো স্থানে বসবাসের জন্য প্রয়োজন জল ও স্যানিটেশন। শীতপ্রধান অঞ্চলগুলিতে এই ধরনের ব্যবস্থা প্রায় দুষ্প্রাপ্য। যার ফলে সৈন্যদের সম্বল হলো— অস্থায়ী সমাধান।

বিচ্ছিন্নতা : দূরবর্তিতা এবং কঠোর আবহাওয়া সৈন্যদের মধ্যে একাকিত্ব এবং মানসিক চাপের সৃষ্টি করে।

স্বাস্থ্য ঝুঁকি : তুষারপাতের দরুন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এবং অধিকতর উচ্চতার সংমিশ্রণ--- হাইপোথার্মিয়া এবং উচ্চতাজনিত অসুস্থতার ঝুঁকি বাড়ায়। বিগত বছরগুলিতে ভারতীয় সৈন্যরা যা মোকাবিলা করেছে, তার থেকে সমস্যাগুলির চরিত্র এবার অনেকটাই আলাদা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। কারণ আগে সৈন্যরা শীতকালে তাঁদের অবস্থান থেকে কিছুটা পিছিয়ে আসত বা অপেক্ষাকৃত নিম্ন উচ্চতার ঘাঁটিগুলিতে অবস্থান করত, কিন্তু এখন তারা এগিয়ে (Forward posture-এ) থাকছে এবং শত্রুর সঙ্গে চোখে চোখ রেখে সামনের পোস্টগুলি পরিচালনা করছে। আগে তারা ঘাঁটিতে অবস্থান করত, এলএসি-তে টহল দিতে যেত এবং ফিরে আসত। কিন্তু এই বছর, এমন জায়গায় আমাদের সৈন্যরা আছেন যেখানে কেউ আগে কখনও অবস্থান করেনি।

বহু সংখ্যক সৈন্য যে সমস্যার সম্মুখীন : প্রায় ৫০ হাজার সৈন্য এই সময় এলএসি-তে মোতায়েন রয়েছে, যেখানে আগে সর্বাধিক ১০ হাজার সৈন্য এই অঞ্চলে পর্যায়ক্রমে (rotational) অবস্থায় থাকতেন। এই বছর ঘাঁটি, পোস্ট ও পিকেটগুলিতে রসদ সরবরাহ ব্যবস্থারও একটি পরিবর্তন হয়েছে। প্রবল তুষারপাতে জোজি লা (পাস বা গিরিপথ) এবং মানালি উপশি রোড বরফে অবরুদ্ধ হয়ে যায়। তাই, তুষারপাত শুরু হওয়ার আগেই সীমান্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিভিন্ন রসদের শীতকালীন মজুদের কাজটি শেষ করতে হয়।

এটি একটি বড়ো মাপের সমস্যা। দৌলত বেগ ওল্ডিতে (ডিবিও সেক্টরে) তিন থেকে চার ব্যাটালিয়ন সৈন্য মোতায়েন থাকতে পারে, যা আগের তুলনায় অনেক বেশি। এমনকী গালওয়ান এবং হট স্প্রিংসেও বিপুল সংখ্যক সেনা মোতায়েন থাকে। গত বছর দুরবুক-শিওক-ডিবিও সংযোগকারী রাস্তা ছাড়াও সরবরাহ ব্যবস্থা সচল রাখার জন্য কিছু রাস্তা নির্মিত হয়েছে। লাদাখে ওই পরিমাণ উচ্চতায় হিমায়িত অবস্থার সঙ্গে লড়াই করার ক্ষেত্রে ভারতীয় সৈন্যদেরও দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি বদলে গিয়েছে। এখানে অক্সিজেনের মাত্রা আমাদের

ফ ঃ ৬

শহরে যা শ্বাস নিই তার প্রায় অর্ধেক। এমনকী জলও এখানে দুর্লভ, কারণ সবকিছুই জমে যায়। প্রতি বছর শীতকালে পাঁচ থেকে ছয় মাস, লাদাখ দেশের বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, যার কারণ লাদাখের দিকে যাওয়ার দুটি রাস্তা, রোহতাং এবং জোজি লা পাস বন্ধ হয়ে যায় গভীর তুষারপাতের জন্য। নিঃসন্দেহে শীতকাল হিমালয়ে উপস্থিত সৈন্যদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক। তবে সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে আসল চ্যালেঞ্জ হলো 'রাস্তা বন্ধ' হওয়ার আগে লাদাখে মোতায়েন সেনাদের কাছে প্রয়োজনীয় সমস্ত রকম রসদ পৌঁছে দেওয়া। এটি প্রতি বছর সেনাবাহিনীর দ্বারা পরিচালিত বড়ো মাপের লজিস্টিক অনুশীলন বা রসদ সরবরাহ অভিযানগুলির মধ্যে একটি এবং এটি 'অ্যাডভান্স উইন্টার স্টকিং (এডব্লুএস) নামে পরিচিত। শীতকালীন পর্বে ছয় মাস ধরে লাদাখের রাস্তা বন্ধ থাকে। এই সময় সৈন্যদের প্রয়োজন হতে পারে এমন প্রতিটি আইটেম সংগ্রহ এবং তার পরিবহণের সঙ্গে জড়িত হলো এডব্লুএস।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর রসদ সরবরাহের ক্ষমতা গত ২৫ বছরে কাশ্মীরের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক উন্নত হয়েছে। পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সেনাকর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। আগে, পার্বত্য অঞ্চলে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত সীমিত হওয়ার ফলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সরবরাহ লাইন ছিল নানা সমস্যার সম্মুখীন। কাশ্মীরের মতো পার্বত্য অঞ্চলে রসদ সরবরাহের শক্তিবৃদ্ধি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানে দূরত্ব স্থান নয়, সময়ে পরিমাপ করা হয়।

বিভিন্ন রাস্তা ও টানেলের সাম্প্রতিক নির্মাণ, অন্যান্য রাস্তাগুলির উন্নয়ন--- ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বিশেষ সুবিধাদান করেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, নতুন উধমপুর-শ্রীনগর-বারামুল্লা রেল লিঙ্কের (USBRL) কাজ প্রায় সমাপ্তির দোরগোড়ায়। এই বছরের শেষের দিকে বা ২০২৫ সালের প্রথমপর্বে এই প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা। এই রেল যোগাযোগ সরবরাহ ক্ষমতাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। '৭০-এর দশকে আমি যখন ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করি, তখন জম্মু রেলওয়ে স্টেশন থেকে আমার রেজিমেন্ট অবস্থানে (বারামুল্লা) পৌঁছাতে ৪ দিন সময় লাগত। এখন রেল সেতু এবং ৫৫টি টানেল তৈরি শেষ হলে সময় লাগবে মাত্র ৬ ঘণ্টা।

একইভাবে লাদাখ সেক্টরে, পূর্ব ফ্রন্টে জোজি লা পাস ছিল প্রধান বাধা। শীতকালে প্রায় ৬ মাস বন্ধ থাকে এই পাসটি। এখন সেখানে একটি টানেল নির্মাণাধীন রয়েছে যা লেহকে শ্রীনগরের সঙ্গে একটি 'অল ওয়েদার রোড' (সবরকম আবহাওয়ায় খারাপ হবে না এমন একটি রাস্তা)-এর মাধ্যমে সংযুক্ত করে। লেহ থেকে ফিরে যেতে জোজি লা হয়ে প্রায় দশ দিন এবং রোহতাং পাসের রুটে ১৪ দিন সময় লাগে। দু'টি রুটে ট্রানজিট ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে যেখানে যানবাহন চালকরা রাতের জন্য বিশ্রাম নিতে পারেন।

এই দুই সপ্তাহের যাত্রায় একজন ড্রাইভার প্রতি রাতে আলাদা জায়গায় ঘুমায় এবং ট্রিপ শেষ করার পরে, অন্য ট্রিপ পুনরায় শুরু করার আগে দুই দিনের বিশ্রাম পায়। আগামী ছয় মাস এই তার রুটিন হবে, কঠিন পাহাড়ি রাস্তা ধরে এক মরসুমে প্রায় দশ হাজার কিলোমিটার গাড়ি চালানোর।

প্রযুক্তি, কৌশল ও সাংগঠনিক কাঠামোর দ্বারা সামরিক সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। সামরিক বাহিনীর কর্মীদের, সরঞ্জাম সরবরাহকারীদের সদা উদ্বুদ্ধ ও সক্রিয় রাখার জন্য এগুলির প্রতিনিয়ত উন্নতি প্রয়োজন। সাম্প্রতিক অতীতে অনুষ্ঠিত HIM-DRONE-A-THON 2 এবং HIMTECH-2024 ভারতকে বিশ্বব্যাপী ড্রোন প্রযুক্তির শীর্ষস্থানে নিয়ে গিয়েছে। ভারতীয় ড্রোন প্রযুক্তির উন্নয়ন, প্রতিরক্ষা স্বনির্ভরতা অর্জনের দ্বারা দেশের প্রতিরক্ষা রপ্তানি বৃদ্ধি হলো ভারত সরকারের লক্ষ্য।

লাদাখে ভারতীয় সেনাকে মাইনাস ৮০ ডিগ্রি তাপমাত্রা সহ্য করতে হয়। এলএসি-তে ১৪ থেকে ১৮ হাজার ফুট উচ্চতায় ভারতীয় সৈন্যদের শীতকাল অতিবাহিত হয়। সুউচ্চ ভূখণ্ডে বিচরণে সক্ষম সেনাবাহিনীর চিতা হেলিকপ্টার ২০ কেজি পর্যন্ত ওজন বহন করতে পারে। সেনাবাহিনী লাদাখের উমলিং লা পাসে (যা বিশ্বের সর্বোচ্চ পরিবহণব্যবস্থা সম্পন্ন সড়ক বা মোটোরেবল রোড-যুক্ত গিরিপথ) ড্রোন উড়িয়ে এবং ড্রোনের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে একটি নতুন বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। এটি ৩০ কেজি পর্যন্ত ওজন বহনে সক্ষম।

চিকিৎসার ফলাফল

সুউচ্চ পর্বতে কম তাপমাত্রা এবং বাতাসে অক্সিজেনের স্বল্পতার মতো চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে একটি ফ্যাক্টর হলো হিমশীতল বায়ুপ্রবাহ। বাতাসের গতি ৩ কিমি / ঘণ্টা হওয়ার কারণে ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা হ্রাস হয়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে একটি পোস্ট স্থাপনের জন্য নানা পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। তাঁবুগুলি উড়ে যাওয়া বা ভারী তুষারপাতের কারণে অস্থায়ী ঘরগুলিগুলি অবরুদ্ধ হওয়া এড়াতেই এই পরিকল্পনা। বিদেশ থেকে সরাসরি লেহ বিমানবন্দরে সেনাবাহিনীর জন্য আমদানি করা শীতকালীন আশ্রয়কেন্দ্র এবং তার ভিতরের বাংকগুলির কিছু ছবি ইন্টারনেটে দেখা যায়। এই উচ্চতায় সৈন্যরা প্রায়শই ঠাণ্ডা-সম্পর্কিত নানা ব্যাধি যেমন পালমোনারি ও সেরিব্রাল ইডিমা, হাইপোথার্মিয়া, চিলব্লেইনস এবং ফ্রস্টবাইট দ্বারা প্রভাবিত হয়। রোগাক্রান্ত সেনাদের হেলিকপ্টারে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় সেনাবাহিনীকে বিশেষ পোশাক ব্যবহার করতে হয়। ১১ হাজার ফুট পর্যন্ত ব্যবহারের জন্য সাধারণ গরম পোশাক পাওয়া গেলেও অধিকতর উচ্চতার জন্য বিশেষ পোশাক প্রয়োজন, যা সংগ্রহের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর নিজস্ব প্রক্রিয়া রয়েছে। সেখানে ভারতীয় সৈন্যদের হাঁটু পর্যন্ত বরফের মধ্য দিয়ে টহল দিতে হয়। এই ভয়ংকর চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও আমাদের সৈন্যরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দেশের নিরাপত্তা, একতা ও অখণ্ডতা রক্ষায় তাঁরা জীবন উৎসর্গের জন্য তৈরি থাকে। ভারতীয় সেনাবাহিনী কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই অঞ্চলে তাঁদের উপস্থিতি জোরদার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তারা সদা সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে, সামনে আসা কঠিন শত্রুর পরোয়া তাঁরা করেন না।

২০২০-পরবর্তী পর্যায়ে এই বছরে পঞ্চম শীতকালীন পর্বে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলএসি) বরাবর মোতায়েন হওয়ার জন্য ভারতীয় সেনার প্রস্তুতি পর্বের সঙ্গে তাদের অননুকরণীয় সাহসিকতা প্রতিটি ভারতীয়ের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'When the going gets tough, the tough get going' (অর্থাৎ, পরিবেশ-পরিস্থিতি যখন হয়ে ওঠে চরম প্রতিকূল, সেই মুহূর্তে শক্তিশালী মানুষেরা কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকেন)— এই প্রবাদটি সীমান্তে অবস্থানরত সৈন্যদের জীবনে গভীরভাবে অনুরণিত হয়, যারা বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক তুষারাবৃত সীমানাগুলি রক্ষা করার দায়িত্বে রয়েছেন। এই সাহসী বীর সন্তানরা রাত জাগে, যাতে আপনি ও আমি রাতে শান্তিতে ঘুমাতে পারি।

□

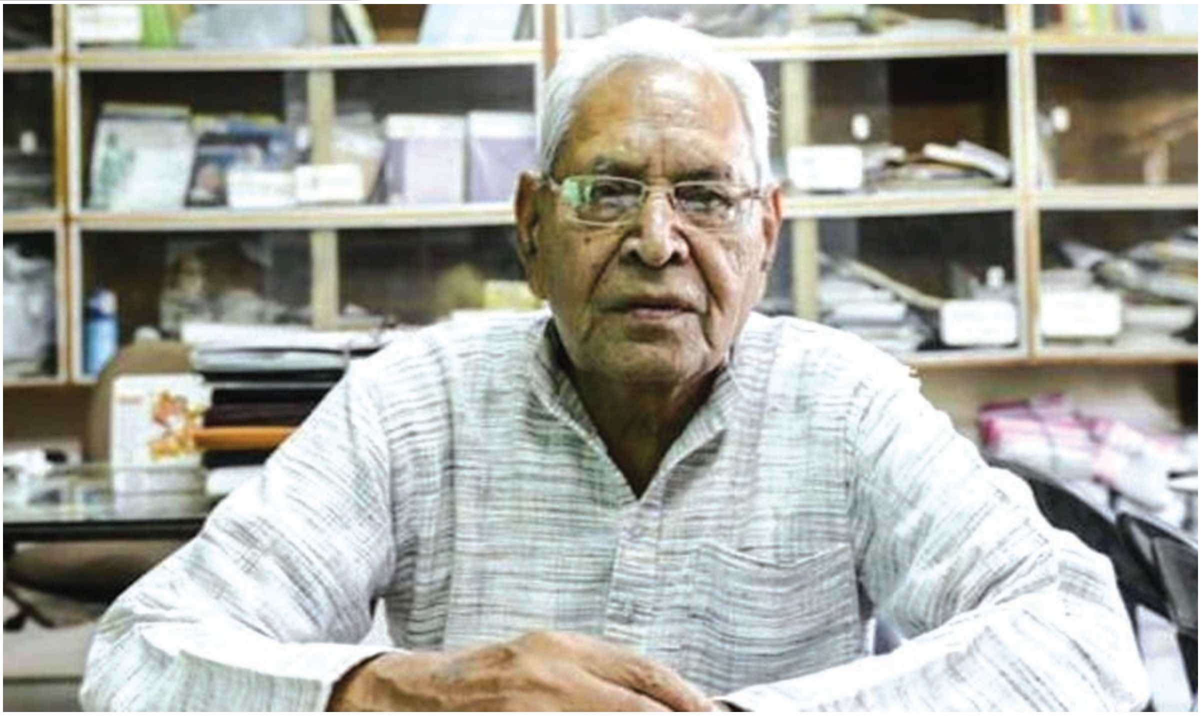

সারস্বত সাধক দীননাথ বত্রা : এক পরিচয়

দেবাংশু পতি

ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতিতে তথ্যাত্মক ও গুণাত্মক সংশোধনের জন্য সমর্পিত যোদ্ধারূপে সুপরিচিত দীননাথ বত্রার জন্ম ৫ মার্চ, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে পঞ্জাব (বর্তমানে পাকিস্তানে)-এর 'ডেরা-গাজীখান' জেলার রাজনপুর গ্রামে। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা এমএ, বিএড। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অগ্রণী ভূমিকার কথা সকলের জানা। তখন তাঁর ছদ্মনাম ছিল 'গোলাপ'। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট ভারত ভাগের সময় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে হিন্দু শরণার্থীদের ভারতে নিয়ে আসার দায়িত্ব যে কজন স্বয়ংসেবকের উপর ছিল তাঁদের মধ্যে বত্রাজী ছিলেন অন্যতম। নিজেদের হাতে পদ্মের বিশেষ গুপ্তচিহ্ন এঁকে মুসলমানের ছদ্মবেশে পাকিস্তানে গিয়ে হিন্দুদের নিয়ে আসার মতো দুঃসাহসিক কাজেও তিনি পিছপা হননি।

১৯৫৫ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত ডিএভি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রূপে এবং ১৯৬৬ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত গীতা বরিষ্ঠ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কুরুক্ষেত্রের প্রধানাচার্য রূপে শিক্ষা জগতে অনেক কাজ করেছেন। ওই বিদ্যালয় থেকেই তিনি আদর্শ শিক্ষক রূপে রাষ্ট্রপতি সম্মানে ভূষিত হন।

১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে 'বিদ্যা ভারতী অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থান'-এর অখিল ভারতীয় মহামন্ত্রী (অখিল ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক)-র দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ভারতকেন্দ্রিক, হিন্দুত্বনিষ্ঠ রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক আন্দোলনের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, সারস্বত সাধক, বাগ্মী রূপে বিদ্যা ভারতীকে শিক্ষাক্ষেত্রের উচ্চশিখরে পৌঁছে দিয়েছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ত্রুটি গভীরভাবে অধ্যায়ন করে তা ত্রুটিমুক্ত করার জন্য সতত প্রয়াস করেছেন। তিনি ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে 'শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন সমিতি'-র রাষ্ট্রীয় সংযোজকের দায়িত্ব গ্রহণ করে তৎকালীন ভারত সরকার দ্বারা প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক ও নীতিতে মার্কস, মেকেলে ও মাদ্রাসার দ্বারা প্রভাবিত মনোবৃত্তি এবং বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্ন তুলেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের গৌরবের প্রতি জেনেশুনে হীন মনোভাব উৎপন্নকারী অসম্মাননীয় বিবরণ ও পাঠ্যাংশগুলিকে ন্যায়ালয়ের আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাদ দেওয়ার মতো অভূতপূর্ব কাজ করেছেন, যা তাঁকে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

২০০৬ খ্রিস্টাব্দে 'এনসিইআরটি'-এর বিরুদ্ধে তিনি পিআইএল দ্বারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান পুস্তকের প্রায় ৭৫টি আপত্তিজনক বিবরণের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। যার ফলস্বরূপ দিল্লি উচ্চ ন্যায়ালয় দ্বারা গঠিত সমিতি ৩০ জানুয়ারি, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে সবকটি আপত্তিজনক বিবরণকে বাদ দিতে বাধ্য হয়েছিল। এই সব বিবরণে বলা হয়েছিল— লাল লাজপত রায়, বিপিন চন্দ্র পাল, বালগঙ্গাধর তিলক, ঋষি অরবিন্দ ঘোষ এবং সর্দার ভগৎ সিংহ সন্ত্রাসবাদী ছিলেন; ভারতীয় আর্য তথা ব্রাহ্মণগণ গোমাংস ভক্ষণ করতেন ইত্যাদি। বিষয়গুলিকে ন্যায় সমিতি রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক কার্যক্রমের পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ দিয়েছে। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা যৌন শিক্ষা (Sex Education)-কে বিদ্যালয় শিক্ষায় সংযুক্ত করে। তিনি মনে করতেন যৌন শিক্ষা (Sex

Education) ভারতীয় জীবন-দর্শনের পরিপন্থী চিন্তাভাবনা, এর ফলে যুব সমাজে অবক্ষয় দেখা দেবে। তাই বত্রাজীর নেতৃত্বে দেশজুড়ে প্রতিবাদ শুরু হলো। সরকার চাপে পড়ে যৌন শিক্ষা (Sex Education) বন্ধ করতে বাধ্য হলো। তিনি মনে করতেন, যৌন শিক্ষা (Sex Education)-এর পরিবর্তে 'যোগ' ও 'চরিত্র নির্মাণ এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের শিক্ষা' পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করলে ভারতীয় যুবসমাজকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। তিনি ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন সমিতির পক্ষে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস পাঠ্যক্রমে (History Syllabus) একে রামানুজের আপত্তিজনক লেখা 'থ্রি হান্ড্রেড রামায়ণস্ : ফাইভ একজাম্পল অ্যান্ড থ্রি থর্টস্ অন ট্র্যানসলেইশন'- এর বিরুদ্ধে দিল্লি উচ্চ ন্যায়ালয়ে একটি মামলা দায়ের করেন। ফলত, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য একটি বিশেষ সমিতি গঠন করে এবং পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দিয়ে দেয়। এইরকম ২০১০ খ্রিস্টাব্দে 'পেঙ্গুইন গ্রুপ'-এর ওয়েন্ডি ডোনিগর-এর পুস্তক— 'দ্য হিন্দুজ : এন অল্টারনেটিভ হিস্ট্রি'-র কিছু কিছু বিবরণের বিরুদ্ধে এবং 'ফ্রন্টলানি ম্যাগাজিন'-এর সম্পাদক এন রাম-এর 'শর্টকার্ট টু হিন্দুরাষ্ট্র' শীর্ষক লেখার বিরুদ্ধে আইনি নোটিশ জারি করেন। ফলে 'ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসওয়ান, কোম্পানির প্রকাশক মেধা কুমারের 'কমউনিজম অ্যান্ড সেক্সচুয়াল ভায়োলেন্স : আমেদাবাদ সিন্স ১৯৬৯' পুস্তকের বিমোচন কার্যক্রম বন্ধ করতে বাধ্য হন। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত— 'ফ্রম পলাশী টু পার্টিশন : এ হিস্ট্রি অব মর্ডান ইন্ডিয়া' পুস্তকটিও পুনর্বিবেচনার জন্য স্থগিত করে দিয়েছিলেন। জুন ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে বত্রাজী দ্বারা লিখিত ৬টি হিন্দি পুস্তককে গুজরাটি ভাষায় অনুবাদ করে রাজ্য শিক্ষা পাঠ্যক্রমে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এই প্রকার শৈক্ষিক সংস্থাতে ভারতীয় বিচারধারা যুক্ত করে শিক্ষার স্বরূপ বদলানোর দৃষ্টিতে আমৃত্যু কাজ করে গেছেন।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে শিক্ষাক্ষেত্রকে ভারতকেন্দ্রিক ও হিন্দুত্বনিষ্ঠ করা, তার অনুরূপ পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক রচনা প্রভৃতি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ২০০৭ সালের ১৮ মে দিল্লিতে 'শিক্ষা সংস্কৃতি উত্থান ন্যাস' গঠন করা হয়। যার রাষ্ট্রীয় সচিব (মন্ত্রী)-এর দায়িত্ব দীননাথ বত্রাজীকে দেওয়া হয়। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে ভারতের শৈক্ষিক সংস্থানগুলি থেকে মার্কস, মেকলে ও মাদ্রাসা নামধারী রাহুর হাত থেকে মুক্ত করার সতত প্রয়াস চলে। এখনো নিয়মিত পত্রপত্রিকা ও পুস্তক প্রকাশ করাও হচ্ছে।

শিক্ষার সঠিক স্বরূপ : চরিত্র নির্মাণ, ব্যক্তিত্ব বিকাশ, নারী শিক্ষা, ভারতীয় মনোবিজ্ঞান, ভারতীয় গণিত, প্রফেশনাল সংস্থাগুলিতে মূল্য-শিক্ষণ, বৈচারিক প্রদূষণ, ব্রিটিশকালের আগে ভারতীয় শিক্ষা এবং বৈকল্পিক শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক পুস্তক রচনা করেছেন। সময়োপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য বিদ্বৎ-সমাজে জাগরণ ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তিনি মনে করতেন— আমাদের 'শিক্ষক' নয়, আমাদের 'আচার্য' চাই। তাও কোনো একটি বিষয়ের নয়, পুরো সমাজের। তিনি সহৃদয় কবি তো ছিলেনই, সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রবাদী লেখকও ছিলেন। তাঁর রচিত 'ভারতীয় শিক্ষা কা স্বরূপ' ও 'দ্য এনিমিজ্ অব ইন্ডিনাইজেশন : দ্য চিল্ড্রেন অব মার্কস, মেকলে অ্যান্ড মাদ্রাসা' পুস্তক দুটি সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করে। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ নভেম্বর হরিয়ানা সরকার প্রাক্তন শিক্ষা অধিকর্তাদের সমিতি গঠন করে বত্রাজীকে তার নির্দেশক নিযুক্ত করে। 'শ্রী বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়' দ্বারা ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে এই রাষ্ট্রভক্ত ন্যায়নিষ্ঠ শিক্ষাবিদ্‌কে রাষ্ট্রনির্মাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের ১২৫তম জন্মজয়ন্তীতে কলকাতায় 'হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান'-এ ভূষিত করা হয়। আরও অনেক সম্মানে তাঁকে ভূষিত করা হয়েছে।

গত ২১ কার্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার শুক্লা ষষ্ঠী তিথি, বিক্রম সংবৎ— ২০৮১, যুগাব্দ-৫১২৬, ৭ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে ৮৪ বছর বয়সে সূর্যরথে আরোহণ করে অমৃতলোকে গমন করেছেন। তাঁর প্রয়াণে ভারতের শিক্ষাজগতে এক মহানক্ষত্রের পতন ঘটল।

(বার্তা প্রেষক : প্রান্ত সংযোজক, বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদ প্রচার-প্রসার বিভাগ)

কুর্নুলে নির্মিত হতে চলেছে ১০৮ ফুট উচ্চতাসম্পন্ন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুলে মন্ত্রালয়মে নির্মিত হতে চলেছে একটি ১০৮ ফুট উচ্চ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি। তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে স্থাপিত হবে ভগবান শ্রীরামের এই ভব্য মূর্তি। মূর্তিটি নির্মাণে ব্যয় হবে পাঁচশো কোটি টাকা। মূর্তিটি ভারতের মধ্যে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সর্বোচ্চ মূর্তি হতে চলেছে। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে অনলাইনে মূর্তিটির শিলান্যাস করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। মূর্তিটির রূপকার হলেন গুজরাটে স্থাপিত 'দ্য স্ট্যাচু অফ ইউনিটি'-র ভাস্কর রাম সুতার। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সর্বোচ্চ মূর্তিটির নির্মাণ ও স্থাপনের জন্য ১০ একর জমি দান করেছে শ্রীরাঘবেন্দ্র স্বামী মঠ। আড়াই বছরের মধ্যে মূর্তি নির্মাণ প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে বলে

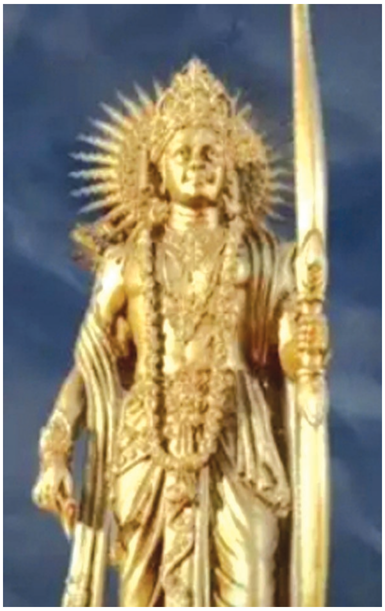

সংবাদসূত্রে খবর। ভগবানের মূর্তিটি হিন্দু ধর্ম এবং বৈষ্ণব পরম্পরার বার্তাবাহী হতে চলেছে বলে খবর। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা-সহ ভারতীয় মূল্যবোধের প্রতীক রূপে প্রতিভাত হতে চলেছে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের এই ভব্য মূর্তি।

দেশের বিরোধী দলগুলি উত্তর ভারত-দক্ষিণ ভারতের মধ্যে বিভাজনের রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছে পুরোদমে। ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে নির্মীয়মাণ এই মূর্তিটি অন্যরকম একটি বার্তা বহন করছে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র হলেন সেই ঐশী শক্তি যা সমগ্র ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রাখে, বর্তমান বিরোধী দলনেতার হাতের মুঠোয় থাকা লাল বইটি (যার ভিতরের পৃষ্ঠাগুলি ফাঁকা) নয়।

কাঁকিনাড়া গঙ্গা আরতি সমিতির পরিচালনায় গঙ্গা আরতি অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত ১৫ নভেম্বর কাঁকিনাড়া গঙ্গা আরতি সমিতি পরিচালনায় এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ধর্ম জাগরণ সমন্বয় (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)-এর সহযোগিতায় গত ১০ বছর ধরে চলা কার্তিক পূর্ণিমা (রাসপূর্ণিমা বা দেবদীপাবলি) তিথিতে কাঁকিনাড়া পেপার মিল গঙ্গাঘাটে সম্পন্ন হলো গঙ্গা আরতির অনুষ্ঠান। অন্যান্য বছরগুলির মতো এবারও অসংখ্য মানুষের সমাগমে ওই অঞ্চলে এই অনুষ্ঠান ব্যাপক সাড়া জাগায়। এই বছর কাঁকিনাড়ার গঙ্গা আরতির অনুষ্ঠান ১১তম বছরে পদার্পণ করল।

এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন বেলডাঙ্গা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ, রিষড়া প্রেম মন্দিরের সন্ন্যাসী পূজ্যপাদ স্বামী নির্গুণানন্দজী মহারাজ, কাঁচরাপাড়া-ধরমপুর বিশ্ব বিবেকানন্দ মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী শক্তি মহারাজ এবং দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের ধর্ম জাগরণ সমন্বয়ের সহ-সংযোজক রতন চক্রবর্তী। কয়েক হাজার মানুষ এই ভব্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে সকলের যোগদানে অনুষ্ঠানস্থল হয়ে ওঠে আনন্দ-মুখরিত।

জেহাদি আক্রমণে আক্রান্ত বেলডাঙ্গা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১৫ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গায় হরিমতী স্কুলের কাছে আয়োজিত একটি সর্বজনীন কার্তিক পূজায় আলোকসজ্জার অন্তর্গত একটি বিতর্কিত গ্লোসাইন বোর্ডকে কেন্দ্র করে বেলডাঙ্গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে বীভৎস জেহাদি তাণ্ডব। হিন্দুদের বাড়ি ও দোকানঘরগুলিতে অগ্নিসংযোগ করতে থাকে উন্মত্ত সন্ত্রাসবাদীরা। থানা থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বের এলাকাগুলিতে সর্বত্র অবাধে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চলতে থাকলেও পুলিশ ছিল নির্বাক দর্শকের ভূমিকায়। পুলিশের সামনেই জেহাদিরা বোমা ছোঁড়া থেকে শুরু করে হিন্দুদের ঘরগুলিতে আগুন লাগাতে থাকে। প্রায় দু'দিন ধরে প্রবল জেহাদি অত্যাচারের মুখে পড়ে স্থানীয় হিন্দুসমাজ।

আল্লা-র নামে কোনো একটি আপত্তিকর শব্দ ওই গ্লোসাইন বোর্ডে ছিল অভিযোগ। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে যে সর্বজনীন কার্তিক পূজামণ্ডপের প্রবেশদ্বারে থাকা এলইডি গ্লোসাইন বোর্ডটি যে কারিগর তৈরি করেছিল, সে একজন মুসলমান। হিন্দুদের পূজায় বাধা দেওয়া এবং হিন্দু নির্যাতনের উদ্দেশ্যেই এই জেহাদি পরিকল্পনা বলে খবর। সেই প্ল্যানমাফিক গ্লোসাইন বোর্ডটির ছবি বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করা হয়। স্থানীয় মসজিদগুলি থেকে মাইকে ব্যাপকভাবে উসকানি ও প্ররোচনা দেওয়া শুরু হয়ে যায়। ইন্টারনেটের মাধ্যমেও ব্যাপকভাবে চলতে থাকে জেহাদি উসকানি। তারপরই বেলডাঙ্গার বুকে শুরু হয় জেহাদিদের উন্মত্ত সন্ত্রাস! হিন্দুদের বাড়িঘর, দোকানপাটে জেহাদিরা অগ্নিসংযোগ শুরুর পরেই জ্বলন্ত ঘরবাড়ির ছবি, ভিডিয়ো ফুটেজ বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে পড়ে।

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, গ্লোসাইন বোর্ডের বিষয়টি নিয়ে পূজা কমিটির সদস্যরাও কিছুই জানতেন না। কার্তিক পূজার লাইটিং ডেকরেশন বা আলোকসজ্জার কন্ট্র্যাক্ট দেওয়া হয়েছিল মাঝেরপাড়া ইলেকট্রিকাল মার্টের মালিক শেখ বসিরকে। পূজা কমিটির সদস্যদের অজ্ঞাতসারে বিতর্কিত গ্লোসাইন বোর্ডটি প্রস্তুত হয়। বোর্ডটিকে কেন্দ্র করে বেলডাঙ্গা জুড়ে আচমকা জেহাদি আক্রমণ শুরু হলে স্থানীয় হিন্দুরা হতভম্ব হয়ে যায়। কার্তিক পূজাকে কেন্দ্র করে আনন্দমুখর উৎসব, শান্তিপূর্ণ অনুষ্ঠানের পরিবেশ নিমেষে অশান্ত হয় একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জেহাদি বিষবাষ্পে। সেই সম্প্রদায়েরই দু'জন কারিগর এই আলোকসজ্জার সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে অন্য একটি সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর তারা নিখোঁজ বলে জানা যায়।

বেলডাঙ্গায় হিন্দুদের আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ তুলে ধরে এক্স-হ্যান্ডেলে ট্যুইট করেন ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার এবং সেন্ট্রাল মিডিয়া সেল ইনচার্জ অমিত মালব্য।

পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে হিন্দুদের উপর চলতে থাকা ভয়াবহ অত্যাচার এবং জেহাদি সন্ত্রাসের প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের নির্লিপ্ত ভূমিকা, রাজ্যের তরফে নির্লজ্জ জেহাদি তোষণ, সন্ত্রাস-বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলিতে রাজ্য পুলিশের নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়ে তাঁরা ট্যুইট করার মাধ্যমে সোচ্চার হন। হিন্দুদের পালাপার্বণ, উৎসব-অনুষ্ঠানগুলিকে টার্গেট করে করে জেহাদি সন্ত্রাসের ঘটনাবলী রাজ্য জুড়ে দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত থাকার ফলে পশ্চিমবঙ্গ বাঙ্গালি হিন্দুদের কবরখানায় পরিণত হয়েছে বলে তাঁরা সরব হয়েছেন। এই ঘটনার পর বেলডাঙ্গায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে রাজ্য প্রশাসন।

অর্থনীতিতে ভারত হতে চলেছে আরও শক্তিধর ঃ ক্রিসিল সমীক্ষা

সাত বছরের মধ্যে ভারতের অর্থনীতি হতে চলেছে সাত লক্ষ কোটি মার্কিন ডলারের। অনুমান করা হচ্ছে দেশের অর্থনীতিতে ৬.৬ শতাংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। রেটিং এজেন্স ক্রিসিলের সমীক্ষা অনুযায়ী ২০২৫ থেকে ২০৩১ সালের মধ্যেই ভারতের অর্থনীতিতে বড়ো ধরণের অগ্রগতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

দেশের গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট বা জিডিপি বৃদ্ধির হার বর্তমান অর্থবর্ষে ৬.৮ শতাংশে পৌঁছাতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে রাজস্ব হ্রাস করার উপর জোর দেওয়ায় কারণে, তার একটি ইতিবাচক ফলাফল বৃদ্ধির হারের উপর পড়বে বলেই আশা করা হচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে দেশে খুচরা মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ ৫.৪ থেকে কমে ৪.৫ শতাংশে আসবে।

দেশের বর্তমান আর্থিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুকূলে থাকার কারণে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে আগামীতে রপ্তানির ক্ষেত্রও সুগম হবে। সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, এই বছর খরিফ শস্য বপনের পরিমাণ অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে উৎপাদনের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা জাতীয় অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলবে বলেই অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের অনুমান। ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের বৈদেশিক সম্পর্ক বিগত বছরে আরও সুদৃঢ় হওয়ায় ভারতের তৈরি জিনিসপত্রের জন্য বিশ্বের বিরাট বাজারের পথ বিস্তৃতি লাভ করছে। দেশ ও বিদেশের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ তাঁদের সমীক্ষা থেকে ভারতের অর্থনীতিতে উত্থানের বিষয়ে আশাবাদী।

নাইজেরিয়ার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত ভারতের প্রধানমন্ত্রী

তিন দেশের বিশেষ প্রবাসে গত ১৭ নভেম্বর নাইজেরিয়াতে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে তাঁকে সে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মান 'গ্র্যান্ড কম্যান্ডার অব দ্য অর্ডার অব দ্য নাইজার'-এ সম্মানিত করা হয়। নাইজেরিয়াতে এটিই তাঁর প্রথম প্রবাস। আর সেখানেই প্রধানমন্ত্রী মোদীর ১৭তম আন্তর্জাতিক সম্মান প্রাপ্তি। ১৯৬৯ সালের পর কোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে এই সম্মান প্রদান করা হলো।

১৭ তারিখেই নাইজেরিয়ার মাটিতে পা রাখেন মোদী। আবুজা এয়ারপোর্টে রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ টিনুবু তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। তাঁর এই প্রবাস দুই দেশের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

আবুজা শহরে আয়োজিত অন্য একটি অনুষ্ঠানে নাইজেরিয়ার মন্ত্রী ন্যেসোম এজেনবো ওয়াইক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে একটি চাবি—'কি টু দ্য সিটি' উপহার দেন। সম্মান ও বিশ্বাসের প্রতীক স্বরূপ এই চাবি দুই দেশের মধ্যে মিত্রতার দ্বার খুলে দিবে।

সম্প্রতি মারাঠি ভাষাকে ধ্রুপদীভাষার মর্যাদা প্রদানের জন্য সেদেশে বসবাসকারী মহারাষ্ট্রবাসীরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সেখানে মহারাষ্ট্রের পরম্পরাগত নৃত্য 'লাভনি' পরিবেশন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর এই যাত্রায় ব্রাজিল ও গুয়ানা সফর করবেন।

নির্মল গঙ্গার লক্ষ্যে গোমুখ থেকে গঙ্গাসাগর স্বচ্ছতায় কেন্দ্রীয় পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করতে বড়ো পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় পরমাণু শক্তি দপ্তরের অধীনস্থ পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র 'ভেরিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রন সেন্টার' (ভিইসিসি)-র। তিন বছরের এই প্রকল্পে গোমুখ থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত সম্পূর্ণ গঙ্গাতট স্বচ্ছতার কাজ করা হবে।

প্রতি বছর গোমুখ তীর্থযাত্রায় বহুযাত্রী আগুন জ্বালানোর জন্য ব্যবহৃত পেট্রোল-ডিজেলের ক্যান, খাবারের প্যাকেট, জলের বোতল সেখানেই ফেলে আসে। এছাড়াও নদীর দুই পাড়ে প্লাস্টিক-সহ অন্যান্য অপচনশীল আবর্জনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থানীয়ভাবে বা সংস্থাগত প্রচেষ্টায় স্বচ্ছতার কাজ প্রায়শই হয়ে থাকলেও তা কোথাও না কোথাও জমা করা ছাড়া উপায় থাকে না, আর সেগুলি ধ্বংসও হয় না। ভিইসিসি-র এই প্রকল্প অনুযায়ী পরমাণু শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আবর্জনা ধ্বংস করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সংস্থার অধিকর্তা সুমিত সোম এবং স্বচ্ছতা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সুমন গুহ জানান, গোমুখ হিমবাহ বেশ খানিকটা বিছিয়ে গেছে। পর্যটকদের ফেলে আসা আবর্জনা পরিবেশে যথেষ্ট কুপ্রভাব তৈরি করছে। নদীর পার্শ্বস্থ আশ্রম, মঠ, মন্দিরের সমিতির সঙ্গে কথা বলে এবং বিভিন্ন জাগরণ কর্মসূচির মাধ্যমে ভ্রমণ, তীর্থযাত্রা বা পর্বতারোহণে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একটা সদর্থক মনোভাব দেখা গেছে। বহু স্বচ্ছতা অভিযানে সাধুসন্ত থেকে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা পাওয়া গেছে।

গত ১৪ নভেম্বর সল্টলেকে এক সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয় যে, এই প্রকল্পের প্রথম পদক্ষেপে গোমুখ থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত প্রায় ৩১০ কিলোমিটার নদীপথের আবর্জনা সংগ্রহ করা হয়, যার পরিমাণ দুই কুইন্টালেরও বেশি। বিভিন্ন ভাগে এই স্বচ্ছতা অভিযানের কাজ করতে করতে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত এই কাজ চলবে। নদী স্বচ্ছ রাখার বিষয়ে সকলের সহযোগিতা এবং কোনোরকম আবর্জনা নদীবক্ষে না ফেলার আবেদন জানানো হয়।

জার্মানির গ্রন্থাগারে আবিষ্কৃত সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি জার্মানির হামবুর্গের একটি ফ্লি মার্কেটের এক প্রাচীন গ্রন্থাগারে একটি সংস্কৃত গ্রন্থ উদ্ধার হয়েছে, তা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। কেননা এই লেখার শৈলী সম্পূর্ণ ভিন্ন। বহু অক্ষর ও শব্দের অর্থ উদ্ধার করতে গবেষকদের বহু সময় ব্যয় করতে হচ্ছে। বহু দেশ ভারত থেকে বহু মূল্যবান সামগ্রী নিজ দেশে নিয়ে গেছে, তার মধ্যে কিছুটা ব্যতিক্রম হলো জার্মানি। তারা প্রচুর গ্রন্থ নিজ দেশে নিয়ে এনেছে। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের একটা অংশ জার্মানিতেই রয়েছে। তবে এই গ্রন্থটি কবে, কোথা থেকে, কীভাবে এসেছে তা এখনও অজ্ঞাত। এখন বিভিন্ন দেশের গবেষকরা একত্রিত হয়ে তার বিশ্লেষণ করছেন। কিছু ভাষাতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক গবেষক এই গ্রন্থকে অজানা কোনো প্রাচীন সাংকেতিক চিহ্ন রূপে দেখছেন। এর রহস্য উন্মোচন হলে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকদের কাছে নতুন দ্বার খুলে দিতে পারে বলে বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা।